# চরিত্র-চিত্র

বা

## সমাজ-সেবার আদর্শ

"পরের দুঃখে কাঁদতে শিখা—তাহাই শুধু চরম নয়
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।
কর্ম্মের জন্য দেহপাত ও ধর্ম্মের জন্য জীবনদান,
সত্যের জন্য দৃঢ়ব্রত, পরের জন্য নিজের প্রাণ।"

—দ্বিজেন্দ্র লাল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক
শ্রীসুনীতিবালা চন্দ, বি-এ
ও
শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-টি
প্রণীত।

—০:::০—

ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট, রায় বাহাদুর
লিখিত ভূমিকা সহিত।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোঃ লিঃ
১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
১৩৩০

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতিভূষণ নাগ
১২ বি, মুসলমানপাড়া লেন,
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোঃ লিঃ
১নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা

# উৎসর্গ-পত্র

—০:৵:০—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার অক্ষয়
কীর্ত্তি, বঙ্গে উচ্চশিক্ষা-বিস্তার যাঁহার ঐকান্তিকী
চেষ্টার শুভময় ফল, যাঁহার প্রভাবে,
সংস্পর্শে ও অনুপ্রেরণায় শত
শত যুবকের জীবনধারা
পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,

সেই আদর্শ চরিত্র, নীতিমান্, একনিষ্ঠ দেশ-সেবক
শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহোদয়ের শ্রীকরকমলে
সমাজ-সেবার এই ক্ষুদ্র চিত্রখানি ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে
অর্পণ করিলাম।

শ্রীসুনীতিবালা চন্দ
শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত

# ভূমিকা

শ্রীমতী স্নুনীতিবালা চন্দ, বি-এ ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-টি, প্রণীত "চরিত্র-চিত্র" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। আজকাল বঙ্গসাহিত্যে বড়লোকদের জীবনচরিতের অভাব নাই। লেখকেরা সেইরূপ জীবনী লিখিতে যাইয়া কোনো বড় লোক কোন্ সনে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটা ধারাবাহিক তালিকা দিয়া থাকেন। এই তালিকায় অনেক সময় ভাবুকতা বা প্রাণ থাকে না—সেই বড়লোকের বিশেষত্ব কি, তিনি কেন আমাদের পূজ্য, তাহা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে না। কিন্তু এই পুস্তকখানি সে শ্রেণীর নহে। লেখিকা ও লেখক বরণীয় ব্যক্তিদের জীবনচরিত শুধু চোখ দিয়া পড়িয়া যান নাই, তাহারা তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। তাহারা অনেক সময় জন্মতারিখ বা নিবাসস্থানাদির উল্লেখমাত্র না করিয়া কোন্ মহৎগুণে তাঁহারা আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধার দাবী করিতেছেন, কৌতূহলোদ্দীপক ভাষায় মুখবন্ধেই সেই কথা পাড়িয়াছেন, এইজন্য বইখানি পড়িয়া আমরা সর্ব্বদা বর্ণিত ব্যক্তিদের বিশেষত্ব কোথায় তাহার পরিচয় পাই। লেখিকা ও লেখক নিজে গুণমুগ্ধ হইয়া পাঠকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, এইজন্য এই পুস্তকখানিতে তাহারা যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন আমাদের সাম্নে আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা কাহারও মাথায় জ্ঞানগরিমার কিরীট, কাহারও কপালে ত্যাগের শুভ্র চন্দনরেখা, কাহারও দানশীল মুক্তহস্তে অজস্ররত্নবর্ষণ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই। উদাহরণ স্থলে শুধু রামমোহন রায়ের কথা বলিব। সাধারণতঃ রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়াই পরিচিত, সাম্প্রদায়িক

লোকেরা তাঁহাকে সেইভাবেই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু এই পুস্তকের লেখিকা ও লেখক তাঁহার ধর্ম্মমতগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই। রাজা রামমোহনকে তাহারা বর্ত্তমান বঙ্গের যুগ-প্রবর্ত্তকরূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। আধুনিক সময়ে বাঙ্গালীরা যে সকল আশা ও উদ্যম লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন, রামমোহন বাঙ্গালীর সেই সমস্ত আশা ভরসা জাগাইয়া দিয়াছেন, রামমোহন আমাদের আধুনিক চেষ্টার শতমুখী গঙ্গাধারার হরিদ্বারস্বরূপ। লেখিকা ও লেখক এই পুস্তকখানিতে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গটি যে ভাবের, এই উপাদেয় আখ্যানগুলি কতকটা সেই ভাবের। পুস্তকের ভাষায় একটা গৌরবশ্রী আছে; তাহা কোথায়ও অস্পষ্ট বা ম্লান হইয়া পড়ে নাই।

৭, বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা
১লা জুন, ১৯২৩

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

# নিবেদন

এই প্রবন্ধগুলিতে তত্ত্বানুসন্ধানের পরিচয়প্রদানের বা প্রবন্ধোক্ত পুরুষ ও রমণীগণের জীবনবৃত্তান্তের আনুপূর্ব্বিক বিবরণবর্ণনের কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। কতিপয় মহাপুরুষ ও বীররমণীর পুণ্যপূত জীবন-সম্বন্ধে যে সকল তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অধ্যয়নকালে যে সকল পবিত্র চিত্র মানসপটে স্বতঃই অঙ্কিত হইয়াছে, শুধু সেই সেই চিত্রগুলি কোমলমতি বালকবালিকাগণের সমক্ষে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। মহাপুরুষগণ জাতিবিশেষের বা ধর্ম্মবিশেষের সম্পত্তি নন; তাঁহারা দেশকালের অতীত, সমস্ত বিশ্বই তাঁহাদিগকে পাইয়া গৌরবান্বিত। তাই হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান, দেশীয় বিদেশীয়, আধুনিক ও প্রাচীন, স্ত্রী-পুরুষ সকলের চরিত্র-চিত্রই এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

যদিও সেবার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমাদের নাই, তথাপি মহচ্চরিত্রের আলোচনাজনিত আমোদভোগের অধিকার সকলেরই আছে। তাই এই স্পর্দ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমরা ইতস্ততঃ করি নাই। সদৃষ্টান্ত নীতিশিক্ষাপ্রদানের উৎকৃষ্ট উপায় এবং সাধুজীবনগঠনের প্রধান সহায়—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রবন্ধগুলির অবতারণা করিলাম। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি বালকবালিকাদের হৃদয়ে প্রবন্ধবর্ণিত ব্যক্তিদের বিস্তৃত জীবনীপাঠের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় এবং পরহিতে আত্মশক্তি নিয়োগ করিবার বিন্দুমাত্র বাসনাও উদিত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

শ্রীসুনীতিবালা চন্দ
শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত

# বিষয়-সূচী।

# চিত্র-সূচী



রাজা রামমোহন

# চরিত্র-চিত্র।

ভারতে নবযুগ-সূচনায়

## রাজা রামমোহন।

"ভুলিতে হবে আপন,
ভুলিতে হবে স্বপন,
জাগাতে হবে জীবন,
তবে সে পারিবে
ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে;
জ্ঞানের শকতি ল'ভে
জগতে যুঝিতে হবে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে।"

—হেমচন্দ্র।

এমন সময় ছিল, যখন হিন্দুসমাজ রাজা রামমোহনকে স্বধর্ম্মত্যাগী জ্ঞানে অবজ্ঞা করিত, যখন হিন্দুগণ তাঁহার মুখ দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিত এবং তাঁহার নামোচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিত। আনন্দের

বিষয় এখন সেই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন হিন্দুমাত্রই কৃতজ্ঞ অন্তরে রাজা রামমোহনের নাম স্মরণ করিতেছে। রামমোহনের জন্মভূমি রাধানগরে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে বিরাট আয়োজন চলিতেছে, দেশের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অনেক হিন্দু সেই শুভানুষ্ঠানের উদ্‌যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। হিন্দুমাত্রই বুঝিতে পারিয়াছে যে রাজা রাম-মোহন ভারতের সেই দুঃসময়ে আবির্ভূত না হইলে, হিন্দুধর্ম্ম অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করিত। বস্তুতঃ প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের গৌরবরক্ষার্থ তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তত্ত্বদর্শী প্রাচীন হিন্দুঋষিগণের অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানসমূহ প্রচার করিয়া এবং হিন্দুধর্ম্মের উদারতা, গভীরতা ও বিশালতা দেখাইয়া একদিকে যেমন তিনি যুবকগণের প্রাণে স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপন করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমন তিনি হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট বেদান্ত ও একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছিলেন। সর্ব্বসাধারণে হিন্দুর সারধর্ম্মের প্রচারার্থ সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে তিনি যেরূপ বেদাদিশাস্ত্রচর্চ্চার পুনরুদ্দীপন করেন, ভারতের সমাজক্ষেত্রেও তিনি তদ্রূপ নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়া-ছিলেন। সর্ব্বপ্রথম তিনিই ভারতবাসীর হৃদয়ে সমাজসংস্কারের ও অন্যান্য উচ্চ ভাবের বীজ বপন করেন; ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারকার্য্যে তিনিই অগ্রণী। এক কথায় তাঁহাকে নবভারতের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান দেশে প্রচারিত না হইলে, দেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধিত হইবে না, জগতের অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ভারত তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে

সমর্থ হইবে না—ইহা তিনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজিশিক্ষা ব্যতিরেকে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি ইংরাজিশিক্ষা প্রচারের এত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং দেশে ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রংপুরের সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, এবং দেশহিতকর কার্য্যে স্বকীয় শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশে শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। সাধারণের শিক্ষার জন্য কোনরূপ বিদ্যালয় ছিল না। সে সময়ে বৈষ্ণব কবিগণের রসমাধুর্য্যপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ মানব-হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতির সঞ্চার করিত সত্য, কিন্তু সরল গদ্যগ্রন্থের অভাবে বাঙ্গালাভাষা সম্পদ্‌শালী হইয়া উঠে নাই। বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালা গদ্য বহুপূর্ব্ব হইতে লিখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাহা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই বৈষ্ণবদিগের লিখিত গদ্য ও ন্যায়ের কয়েক খানি বঙ্গানুবাদ ছাড়া প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যের বড় কিছু একটা নমুনা পাওয়া যায় না। নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম্‌ কলেজের পণ্ডিতগণ যে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল পুস্তকের ভাষা অতি দুর্ব্বোধ্য ছিল। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে নানাবিষয়ে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের 'জনক' বলা হইয়া থাকে।

শিক্ষার অভাবে সমাজে যে সকল দোষ প্রবেশ করে, ভারত-সমাজেও তাহা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে লোকসকল চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, মিথ্যাপ্রবঞ্চনা ও কপটাচর দৈনন্দিন

ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল। শিক্ষালোকবর্জ্জিত নরকুল নানাপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সমাজমুখে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতেছিল। তখন যদিও সুদূর নির্জ্জন গ্রামপ্রান্তে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতমণ্ডলীর চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রালোচনা হইত, তখন যদিও ধর্ম্মপ্রাণ মৌলবীগণের মাদ্রাসায় ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, তথাপি দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ছিল।

কিন্তু শিক্ষাদান শাসনের প্রধান অঙ্গ—ইংরাজশাসকগণ একথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। সেই জন্য তাঁহারা পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে সংস্কৃত, আরবী এবং পার্শী সাহিত্যের শিক্ষাদানকল্পে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতানগরীতে বহু অর্থব্যয়ে এক মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন। সেই মাদ্রাসা অদ্যাপি বিরাজমান থাকিয়া ইংরাজ শাসকগণের শিক্ষানুরাগের ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতঃপর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু আইন, সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কাশীর রেসিডেণ্ট জনথান্ ডন্কানের চেষ্টায় ও উদ্যোগে বারাণসী-ধামে এক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের সে কলেজে অধ্যয়নের অধিকার ছিল না, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও প্রাবল্য সেখানে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কাজেই এইরূপ কলেজ দেশের জনসাধারণের শিক্ষার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী ছিল না।

পক্ষান্তরে ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে ও খৃষ্টান মিশনারীগণের প্রভাবে দেশবাসীর প্রাণে পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভের একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। রামমোহনরায়প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দেখিলেন যে ভারতবাসিগণ ইংরাজিভাষার ন্যায় একটি সজীব ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে, সেই ভাষার সাহায্যে তাহারা পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে প্রয়াস

পাইতে পারিবে। উচ্চগণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরস্থান-বিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের আলোচনার পথও তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে। তাই রামমোহন রায় কলিকাতার কতিপয় পদস্থ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অগ্রণীরূপে ইংরাজশাসকগণকে এশিয়া মহাদেশে য়ুরোপীয় শিল্পবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকল্পে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রামমোহন তাঁহার স্বভাবোচিত দৃঢ়তা ও একাগ্রতা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কলিকাতায় ইংরাজিশিক্ষা বিস্তারকল্পে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। যে স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও আয়োজন চলিতেছে, সেখানেই রামমোহন সহায়তাকল্পে উপস্থিত। শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শমান প্রভৃতি মিশনারীগণ ইংরাজিশিক্ষা প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন; আর রামমোহন পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদের সদনুষ্ঠানে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় মহাত্মা ডাফ্ কলিকাতায় একটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। রামমোহন রায় ইহা জানিতে পারিয়া তখনই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ব্রাহ্মসমাজের গৃহ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ডাফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ছাত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং নিজে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাইয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি অতীব উদার মত পোষণ করিতেন। তাই ডাফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন বাইবেল অধ্যয়ন করিতে আপত্তি উত্থাপন করিল, তখন রামমোহন রায় ছাত্রদিগকে সরলভাবে বলিলেন—

"বাইবেল পড়িলেই খৃষ্টিয়ান হয় না, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বাইবেল পাঠ করিয়াছি অথচ খৃষ্টিয়ান হই নাই, কোরাণ পাঠ

করিয়াছি অথচ মুসলমান হই নাই। আবার হোরেস্ উইলসন সাহেব হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াছেন, অথচ তিনি হিন্দু হন নাই। বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করিবে।" ইহা শুনিয়া বালকগণের আপত্তি করিবার আর কিছু রহিল না।

কলিকাতায় হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাব্যাপারেও রামমোহন অগ্রণী ছিলেন। তিনি ও ডেভিড হেয়ারই কলিকাতার শিক্ষান্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কলিকাতায় একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সবিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহারা তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী স্যার হাইড্ ইষ্ট মহোদয়ের সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। সেই সহৃদয় মহাত্মা কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার আলয়ে আহ্বান করিয়া এবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিলেন। তদনুসারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালনার জন্য একটি কলেজ-কমিটি গঠিত হয়। উহাতে বিশজন দেশীয় ও দশজন য়ুরোপীয় সভ্য ছিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু যখন রক্ষণশীল হিন্দুগণ এবিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিলেন, তখন দেশহিতৈষী রামমোহন অম্লানবদনে কলেজের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। দেশের কল্যাণসাধন যিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও যশের কাঙ্গাল হইতে পারেন? উদারচেতা রামমোহন ধীর ও স্থির ভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নহি।"

দেশের লোক ইংরাজি শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে

থাকিলেও ইংরাজ শাসকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দেশে অসন্তুষ্টি ও অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনকার্য্যে সহায়তা করা সমীচীন বোধ করিলেন না। তাই তাঁহারা প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারকল্পে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধনকল্পে এবং ভারতীয় সাহিত্যের উদ্ধারসাধন ও উন্নতিবিধানার্থ প্রতিবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এক শিক্ষাকমিটি গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের হস্তে শিক্ষার ব্যয়-স্বরূপ সেই একলক্ষ টাকা অর্পণ করেন। সভ্যগণ সেই অর্থদ্বারা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন, এবং প্রাচীন সাহিত্য-চর্চ্চারত পণ্ডিতদিগকে সাহায্য ও প্রাচ্য-সাহিত্য-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। দিল্লী ও আগ্রায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কলিকাতায় অপর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে লাগিল।

এইরূপ অনুষ্ঠানে একদিকে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইল সত্য, কিন্তু সেই সংস্কৃত-শিক্ষা শুধু একদল ব্রাহ্মণের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় দেশের জনসাধারণ শিক্ষালোকবঞ্চিত রহিয়া গেল। সুতরাং সমাজহিতৈষী রামমোহন রায় সাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের উক্ত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ভারতে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। য়ূরোপের সভ্য জাতিসমূহ যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া ভারতকেও উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে হইবে। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে সমস্ত চেষ্টা আবদ্ধ থাকিলে, বর্ত্তমান

যুগে ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাই সূক্ষ্মদর্শী রামমোহন পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশসমূহের অনুকরণে ভারতবর্ষে জীবন-ধারণোপযোগী নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদ্যার আলোচনার্থ নূতন ধরণের কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তিনি শিক্ষাবিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট এক সুদীর্ঘ ও সুযুক্তিপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করিলেন। তাহাতে তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রাচ্য শিক্ষানীতির ভ্রম দেখাইয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি অনুসরণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন, এবং দেশবাসী জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণার্থ য়ুরোপীয় কলেজের অনুকরণে কতিপয় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিলেন। যদিও শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারকল্পে অর্থব্যয় করা লর্ড আমহার্ষ্ট সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, তথাপি তিনি রামমোহন রায়ের আবেদন একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তাই সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে হিন্দুকলেজের জন্য একটী নূতন গৃহনির্ম্মাণের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিলেন। সদাশয় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর হিন্দুকলেজের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ মাসিক নয় শত টাকা সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এইরূপে রামমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতে ইংরাজিশিক্ষা-বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইল এবং ধীরে ধীরে ইংরাজশাসকগণ এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশে এক নবযুগের সূচনা হয়। এই নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতে আজ যে নবজাগরণের ভাব আসিয়াছে, তাহার মূলে এই রাজা রামমোহন।

তৎকালে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর আবির্ভাব না হইলে, ভারতের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই রামমোহনের নামোচ্চারণমাত্রই আজ ভারতবাসীর হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়।

# উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে

# বিদ্যাসাগর।

"সহস্র অন্ধের মাঝে এক চক্ষুষ্মান্
নিজ চক্ষু আবরিয়া লভে কি আরাম?
সে চাহে সহস্রে দৃষ্টি করিবারে দান,
সে চাহে দেখাতে দৃষ্ট আলোকের ধাম।"

—কামিনী রায়।

বঙ্গদেশে এক নব জাগরণার যুগ আসিয়াছে। আজ বাঙ্গালীর প্রাণে নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। নব আশায়, নব আকাঙ্ক্ষায় আজ বাঙ্গালীর হৃদয় উদ্বেলিত; আজ বাঙ্গালী স্বীয় মনোরাজ্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে ব্যগ্র। বাঙ্গালী আজ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, জগতে সভ্যজাতির সমক্ষে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহাকে উচ্চশিক্ষা প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত, সহজলভ্য ও সুগম করিতে হইবে। তাই, বঙ্গদেশে এই উচ্চশিক্ষা-প্রচারকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানে স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধুনা বঙ্গদেশে সর্ব্বসমেত ছত্রিশটি কলেজ বিদ্যমান থাকিয়া উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতেছে। কলেজে অধ্যয়নার্থী যুবকের সংখ্যা দিন দিন দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। নব নব কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ নিযুক্ত হইয়াছেন। উচ্চ-শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের এরূপ আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

বস্তুতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান ভারতের নালন্দায় পরিণত



বিদ্যাসাগর

হইয়াছে! এই জ্ঞানকেন্দ্রে ভারতীয় ও য়ূরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমাবেশ সাধিত হইয়াছে। একদিকে ভারতের নিজস্ব বেদবিদ্ পণ্ডিত, বৌদ্ধশ্রমণ ও আরবীপার্শিভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণ, অপর দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতসমূহ। এই সকল বুধমণ্ডলীর নিত্য কলরবে আজ কলিকাতার সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আহূত প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপকের আসনে আসীন। এখানে জাতিগত পার্থক্য নাই, এখানে দেশগত স্বাতন্ত্র্য নাই, এখানে ধর্ম্মগত বৈষম্য নাই; আছে শুধু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জ্ঞানী ও গুণীর পূজা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি আজ ভারতের সীমাবন্ধন অতিক্রম করিয়া সুদূর য়ূরোপে বিস্তৃত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুকৃতী সন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র আজ স্বকীয় সাধনাবলে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানরাজ্যে এক নবযুগ আনয়ন করিয়া জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার উদীয়মান ছাত্র, উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, নীলরতন-জ্ঞানচন্দ্র-মেঘনাদ-প্রমুখ যুবকগণ বিজ্ঞান-রাজ্যে নূতন নূতন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দেশবিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ দেশবিদেশে ভারতের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে সভ্য জাতির চক্ষে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই মেধাবী ছাত্র ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই বিদ্যামন্দিরের স্বনামধন্য ছাত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অলোকসামান্য প্রতিভা, অনন্যসাধারণ গঠনশক্তি, অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ ছাত্র মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রায়

বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় রত্ন সকল বিস্মৃতি-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছেন।

আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল রত্ন তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ ও মহান্ দৃষ্টান্ত পশ্চাতে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার গুরুদাস বানার্জ্জি অগ্রগণ্য। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা ও শিক্ষাভিজ্ঞতার কথা ভাবিতে গেলে তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের মনু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি উচ্চতম পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও ভারতের জাতীয় ধর্ম্মভাব, আচারনিষ্ঠা, সরলতা ও বিনয়নম্রতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। যে আইনজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার রাসবিহারী অসাধারণ প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, কূট তর্কজাল, যুক্তিবাদ ও বিচারবুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া প্রতীচ্যের সুবিজ্ঞ ব্যবহারাজীবেরও আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তিনিও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্যতম কৃতিমান্ ছাত্র। পালিভাষালোচনার পথপ্রদর্শক, সংস্কৃত সাহিত্যের আজন্ম সেবক, জৈন ন্যায়ের সমালোচক, তিব্বতীয় ও জার্ম্মাণ ভাষার উপাসক, ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও বিশ্ববিদ্যালয়েরই অকাল-কক্ষচ্যুত এক সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ আরও অনেক কৃতী সন্তান আছেন।

কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এবং দেশমধ্যে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের জন্য বর্ত্তমান সময় যাঁহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যার আশুতোষের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যোৎসাহী পুরুষপুঙ্গবের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে আজ দেশমধ্যে উচ্চশিক্ষালাভের এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত হইয়াছে; তাঁহারই প্রেরণায় আজ শত শত

যুবক উচ্চশিক্ষালাভে লালায়িত হইয়াছে। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে বাঙ্গালী পরিচালিত কলেজ স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষা-প্রসারের সহজ ও সরলপথ প্রদর্শন করেন, তিনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের নিকট বঙ্গদেশবাসী অশেষ প্রকারে ঋণী। কি সমাজ-সংস্কারব্যাপারে, কি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে, কি লোকসেবায়, বিদ্যাসাগর যেরূপ উদার হৃদয়ের, অনন্যসাধারণ প্রতিভার এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত না করে, এরূপ লোক বঙ্গদেশে অতি বিরল। কিন্তু দেশে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন, সেই ঋণ অপরিশোধ্য। যে শিক্ষার প্রভাবে আজ আমরা মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে শিক্ষার প্রভাবে আজ আমরা জগতের সভ্য জাতির জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছি, যে শিক্ষার প্রভাবে আমরা আমাদের জাতীয় গৌরব দেশবিদেশে প্রচার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি, যে শিক্ষার প্রভাবে দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে, এবং যে শিক্ষার প্রভাবে মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া কোন কোন বাঙ্গালী যুবক জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে, সেই উচ্চশিক্ষা প্রসারের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করিয়া বিদ্যাসাগর দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

অধুনা কলিকাতা নগরীতে বাঙ্গালীপরিচালিত অনেক কলেজ দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা প্রদানে দেশীয় অধ্যাপকবর্গ যে সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপযুক্ত, সে বিষয়ে কাহারও মনে এখন আর সন্দেহের উদয় হয় না। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন কেবলমাত্র দেশীয় অধ্যাপকের সাহায্যে কলেজ পরিচালনা এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত, যখন বঙ্গদেশবাসী

তাহাদের সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত, এবং নিজকে দুর্ব্বল ও অক্ষম মনে করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিত।

তখনও দেশে ইংরাজি বিদ্যালয় বহুলপরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও এত ব্যয়বাহুল্য হইত যে, দেশের মধ্যবিত্ত লোক অনেক সময় শিক্ষাব্যয় বহনে অসমর্থ হইয়া, শিক্ষাদানের ইচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানকে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিত। মিশনারী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হইত সত্য, কিন্তু জনসাধারণ, চিরন্তন ধর্ম্মসংস্কার-নিবন্ধন, সে সকল বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

এরূপ সময়ে দেশে উচ্চশিক্ষা প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত ও সুগম করিবার :জন্য মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেশবাসীর পক্ষে শিক্ষা সহজলভ্য ও অল্পব্যয়সাধ্য করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া এবং নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অমিততেজে সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীঅধ্যাপক-পরিচালিত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালীর সম্মুখে তিনি এক নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী নগরে নগরে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া সেই মহাত্মার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, এবং দেশবাসী আজ সেই অক্লান্তকর্ম্মা নিঃস্বার্থ সমাজসেবক বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত করিতেছে।

কলিকাতায় এখন যে কলেজটি বিদ্যাসাগর কলেজ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহার পূর্ব্ব নাম মেট্রোপলিটান্ কলেজ। এই মেট্রোপলিটান্ কলেজ

কলিকাতার বাঙ্গালীপরিচালিত কলেজের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়রূপে সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ব্ব হইতেই ইহার পরিচালনা-কমিটির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই শিক্ষালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার ও দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন। তদবধি দিন দিন বিদ্যালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল; ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের এক অদ্ভুত ক্ষমতা ও অপূর্ব্ব কৌশল ছিল। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইয়া, কার্য্যে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রকাশ করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না; অথচ তাঁহার সদয় ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। শিক্ষকনির্ব্বাচনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একবার আলাপ করিয়াই তিনি লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার বিদ্যালয়ে বঙ্গের সুশিক্ষিত ধীমান্ যুবকগণের সমাবেশ দেখিতে পাই।

তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ও স্বদেশপ্রীতি এত অধিক ছিল যে তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ে য়ুরোপীয় শিক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। এমন কি বিদ্যালয়টি যখন উচ্চশিক্ষাপ্রদানোপযোগী কলেজে পরিণত হইল, তখনও তিনি দেশীয় লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক য়ুরোপীয় শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। সুতরাং দেশীয় উপযুক্ত লোক পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে গেলে বাঙ্গালীজাতির বিদ্যাবুদ্ধির উপর পরোক্ষে দোষারোপ করা হয়।

বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিদ্যাসাগরের কলেজের সান্তোষজনক ফল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িল। বৎসরের পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় বিদ্যাসাগরের কলেজের ছাত্রগণ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিতে লাগিল। য়ুরোপীয় অধ্যাপক পরিপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রগণের তুলনায় বাঙ্গালা-অধ্যাপক-পরিচালিত বিদ্যাসাগরের কলেজের ছাত্রগণ কোনও অংশে হীন ছিল না। বিদ্যাসাগরের কলেজের ছাত্রগণ প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় কখনও কখনও গবর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। যে সকল সুনিপুণ ও সুদক্ষ অধ্যাপকের মনোজ্ঞ অধ্যাপনা-প্রণালী-গুণে বিদ্যাসাগর-কলেজ দেশ-মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার লাহিড়ীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শিক্ষাদাননৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু যুবক বিদ্যাসাগর-কলেজে প্রবিষ্ট হইল। ছাত্রাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের অর্থাভাব দূর হইল, এবং অচিরেই বিদ্যাসাগর-কলেজের সুনাম ও সুযশ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

যে বাঙ্গালী জাতি এক সময়ে নিজকে অক্ষম ও দুর্ব্বল ভাবিয়া শিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত, সে আজ তাহার সুপ্ত আত্মশক্তির পরিচয় পাইয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা করিয়াছে। বিদ্যাসাগর কলেজে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার লাহিড়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী যুবক ইংরাজি ভাষার অধ্যাপকরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, বিদেশাগত ইংরাজিভাষাভাষী কয়জন অধ্যাপকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে? প্রতিভাশালী বাঙ্গালী যুবকদিগকে তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মনিহিত শক্তির পরিচয় প্রদানের সুযোগ প্রদান করিয়া, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির যে পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়াই বঙ্গে শত শত যুবক জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশের যুবকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর যদি বাঙ্গালীর জাতীয় শক্তির উন্মেষসাধনে এইভাবে সহায়তা না করিতেন, তবে বাঙ্গালী জাতির গৌরব এত সমুজ্জ্বল আকার ধারণ করিত কি না সন্দেহ।



মহসীন

# মুসলমান সমাজের হিতসাধনে

# মহসান।

"বিশ্বের উন্নতিআশা,
বিশ্বময় ভালবাসা ;
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান,
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান।"

—মানকুমারী।

শতাধিক বর্ষ হইল মহাত্মা মহম্মদ মহসীন মরধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। কিন্তু আজও তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপূত নাম প্রতিদিন প্রতিগৃহে সসম্মানে উচ্চারিত হইতেছে। বিশেষতঃ মুসলমান সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে শত শত নিঃস্ব মুসলমান যুবক শিক্ষার অমৃতাস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে নানাস্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। হুগলী কলেজ এবং কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী মাদ্রাসা তাঁহারই অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান।

মহাত্মা মহম্মদ মহসীন তাঁহার ভগিনীর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। মহসীনের এই ভগিনীর নাম ছিল মন্নুজান খানুম। ইনি হুগলীর তদানীন্তন ধনকুবের আগামোতাহেরের একমাত্র কন্যা। আগামোতাহের পারস্য হইতে দিল্লীতে আগমন করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে তদানীন্তন মোগল-

সম্রাট্ আওরংজীবের প্রিয়পাত্র হন। সম্রাট্ তাহাকে যশোহর জেলায় ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে সুবিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। অবশেষে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হুগলীনগরীতে স্বকীয় আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। মৃত্যুকালে আগামোতাহের তাঁহার প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁহার একমাত্র কন্যা খান্নুমকে প্রদান করিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি নিজের স্ত্রীকে কিছুই দিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তদীয় বিধবা পত্নী হুগলীর হাজি ফজলুল্লা নামধেয় এক বণিকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মহম্মদ মহসীন এই ফজলুল্লার ঔরসজাত সন্তান।

মহম্মদ মহসীন ও মন্নুজান খান্নুম উভয়েই হাজি ফজলুল্লার গৃহে একত্র লালিতপালিত হন। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এক গভীর স্নেহের ভাব সঞ্জাত হইয়াছিল; তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধন দিন দিন আরও দৃঢ়তর হয়। মহসীন গৃহে স্বীয় ভগিনীর সহিত সিরাজী নামক এক সুপণ্ডিত শিক্ষকের নিকট আরবী ও পার্শী শিক্ষা করেন। সিরাজী একজন অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে হুগলীতে আসিয়া উপনীত হন। যখন তিনি তাহার বিস্ময়কর ভ্রমণকাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় ও সুললিতকণ্ঠে বিবৃত করিতেন, তখন মহসীন তন্ময় চিত্তে পরম কুতূহলে তাহা শ্রবণ করিতেন। এই সকল চিত্তাকর্ষক ভ্রমণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা ও দেশ-ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে।

অবশেষে তিনি জ্ঞানার্জ্জনমানসে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সেই স্থানের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে পবিত্র কোরাণশাস্ত্র এবং আরবী ও পার্শী সাহিত্য সম্বন্ধে যতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর,

ততদূর পর্য্যন্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার অতৃপ্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহার মুক্ত আত্মা সারা জীবন মুক্ত পাখীর ন্যায় বিচরণ করিতে লালায়িত হইয়া উঠিল। কাজেই ভগিনীর বিবাহের ও সম্পত্তি রক্ষার আয়োজন করিয়া দিয়া তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সে দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

মুর্শিদাবাদসহরে কতকদিন অবস্থান করিয়া, মহসীন উত্তরভারতের প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিলেন। ভারতভ্রমণ করিয়াই তিনি পরিতুষ্ট হইলেন না। মহাপুরুষ মহম্মদের লীলাভূমি আরবদেশ দর্শন না করিয়া তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান কি দেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন? তাই তিনি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর পরমপবিত্র তীর্থক্ষেত্র মক্কা ও মদিনায় উপনীত হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নামের সঙ্গে হাজি এই পুণ্যজ্ঞাপক আখ্যা সংযোজিত হইল।

কয়েক বৎসর আরব দেশে কাটাইয়া, তিনি তুরস্ক ও পারস্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। পুণ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৎকালপ্রসিদ্ধ নানাস্থানের জ্ঞানকেন্দ্রে অবস্থান করিয়া প্রচুর জ্ঞানও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় সাতাশ বৎসরকাল বিভিন্নদেশ পর্য্যটন করিয়া তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। অবশেষে তাঁহার শরীরে বার্দ্ধক্যের লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইল। পদভ্রমণজনিত শ্রমকষ্ট যদিও মহসীন এতদিন অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন, বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ায় সেই ক্লেশ সহ্য করা এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য, মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

আগমন-পথে তিনি লক্ষ্ণৌসহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানটি সে সময়ে মোস্‌লেম জ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই জ্ঞানকেন্দ্রে হাজি মহম্মদ মহসীন সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। এ স্থানের গুণগ্রাহী বিদ্যোৎসাহী নবাব মহসীনের প্রখর বিদ্যা-বুদ্ধি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে গৌরবসূচক পদ ও যথোপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ধন, মান, যশ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে বিগতস্পৃহ হাজি মহম্মদ মহসীন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় জীবনের সন্ধ্যা শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া, তিনি সেইস্থানেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মুর্শিদাবাদে অবস্থান মহসীনের ঘটিয়া উঠিল না। এদিকে তাঁহার ভগিনীও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এত বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া একজন সুযোগ্য আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরেই তিনি বিধবা হন। তিনি যদিও নিঃসন্তান ছিলেন, তথাপি দ্বিতীয় বার বিবাহ করা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী ছিল না বলিয়া, তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে ভ্রাতা হাজি মহম্মদ মহসীনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে সম্পত্তি অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। বিষয়নিস্পৃহ মহসীন যদিও এই সকল বিষয়ব্যাপারে জড়িত হইতে চান নাই, তথাপি তিনি তাঁহার স্নেহশীলা ভগিনীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। মহসীনের উপর সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়া মনুজান খানুম অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন ধর্ম্মচিন্তায় ও দানধ্যানে কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, মহসীন অতি দীনভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; বিলাস-ব্যসন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই গৃহস্থ সন্ন্যাসী ঈশ্বরোপাসনায়, জ্ঞানালোচনায় ও নরসেবায় তাঁহার দেহ, মন ও প্রাণ সমর্পণ করিলেন। সামান্য আহার ও আড়ম্বরহীন বেশভূষায় পরিতুষ্ট থাকিয়া তিনি অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই সঞ্চিত অর্থ তিনি সমাজ-সেবায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরিসীম দয়ার প্রভাব কি ধনী, কি নির্ধন, কি স্বধর্ম্মী, কি বিধর্ম্মী সকলেই অনুভব করিতে লাগিল।

একদিন মহাত্মা মহসীন ভ্রমণ করিতে করিতে এক পর্ণকুটীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীরখানি অতি ক্ষুদ্রায়তন ও জীর্ণশীর্ণ; চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। ছিদ্রবহুল বেড়া বৃষ্টির গতি রোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ভগ্ন স্থানগুলি ছিন্ন বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরখানা একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, কখন যে ভূমিসাৎ হয়, তাহার স্থিরতা নাই। বাহিরে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ঘরের কোণে একটি উনন রহিয়াছে। সেখানে দুই একটা শূন্য হাঁড়ি গড়াগড়ি যাইতেছে।

কোমলপ্রাণ মহসীনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। সহসা তাঁহার কর্ণকুহরে অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। তিনি আরও অগ্রসর হইলে শিশুর রোদন সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন কয়েকটী শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া আহারের জন্য ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদের বিধবা মাতা ঘরের একপার্শ্বে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিয়াছে। নির্ব্বোধ সরলপ্রাণ শিশুগুলি আহারের জন্য মাতার নিকট পুনঃ পুনঃ আব্দার

করিতেছে। আর সেই নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী জননী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহার গণ্ডস্থল বাহিয়া অবিরলধারে নেত্রবারি পতিত হইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়া মহসীনের দয়া-প্রবণ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি আকুলভাবে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত পরিবারের জন্য আহার্য্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া নিজে তাহাদিগকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। বৃদ্ধা রমণী এইরূপ অপ্রত্যাশিত সাহায্য লাভে কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এই দেব-চরিত্র হৃদয়বান্ মহাপুরুষের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। মহাত্মা মহসীন অতঃপর আজীবন তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহসীন নিজকে তাঁহার বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কমাত্র মনে করিতেন। তাই স্বকীয় সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মে, জ্ঞানানুশীলনে ও সেবাব্রতে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন না। নানাপ্রকার সৎকার্য্যে ও শুভানুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়া তিনি বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও যাহাতে এই সম্পত্তির আয় মানবজাতির কল্যাণসাধনে ব্যয়িত হয়, যাহাতে এই সম্পত্তি ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাপ্রকার হিতকর অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হয়, সেইরূপ বিধান করিবার জন্য বৃদ্ধবয়সে মহসীন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উদার প্রাণ বিশ্বমানবের দুঃখ সন্দর্শনে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাদের অভাবক্লেশ দূরীকরণার্থ তিনি জীবনব্যাপী সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে পাছে সেই সেবাব্রতের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, এই আশঙ্কা বহুদিন যাবৎ তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল। তাই, সময় থাকিতে তিনি এক অপূর্ব্ব

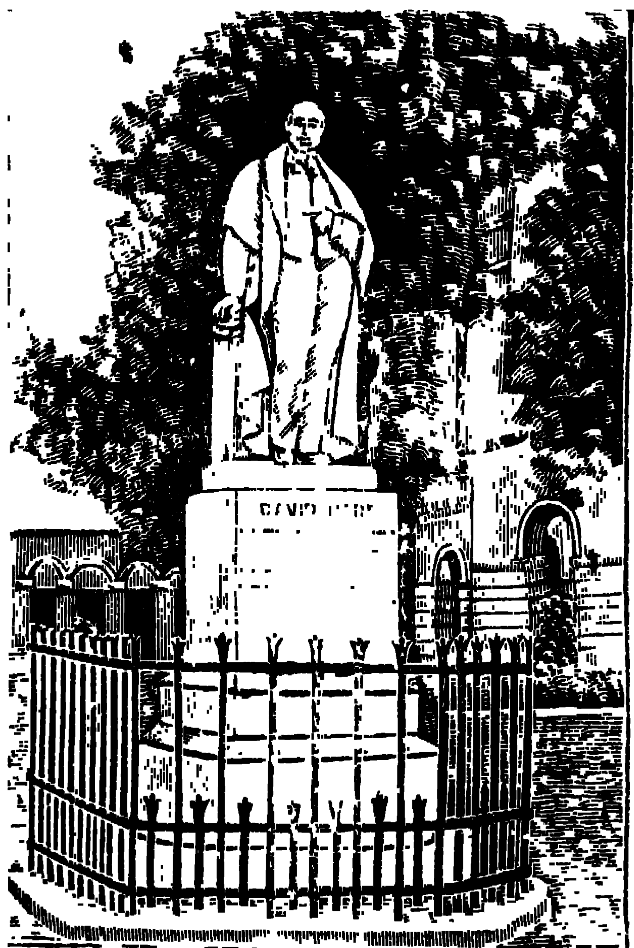
দানপত্র লিখিয়া যান। এই দানপত্রে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ধর্ম্মকর্ম্মে ও পরহিতার্থে উৎসর্গ করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এই দানপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহার প্রতিলিপি অদ্যাপি হুগলীর ইমামবারার প্রাচীর-গাত্রে খোদিত থাকিয়া মহসীনের মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে।

মহসীন যশোহর জেলার সমস্ত জমিদারী, ইমামবারা নামে হুগলীর বসতবাটী, এমন কি গৃহের সমস্ত আস্‌বাবপত্র, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। তাঁহার সম্পত্তির আয় কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহা তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে দানপত্রে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। মহসীন বিধান করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদান করিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সমান নয় ভাগে বিভক্ত হইবে; তিন ভাগ পর্ব্বদিন উপলক্ষে মোতওয়ালীদ্বয় শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিবে; চারিভাগ জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে; দুইভাগ মাত্র মোতওয়ালীদ্বয় তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রহণ করিবে।

দানপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ছয়বৎসর মহসীন জীবিত ছিলেন। যাহাতে মৃত্যুর পর তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির অসদ্ব্যবহার না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি এই ছয় বৎসর দিনরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উহার শৃঙ্খলা বিধান করিয়া যান। এই সম্পত্তির সমস্ত আয়ই তিনি দানখয়রাত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন। স্বল্পতুষ্ট, সংসারবিরাগী, পরদুঃখকাতর, ধর্ম্মপ্রাণ মহসীন নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাসিক কেবলমাত্র একশত টাকা গ্রহণ করিতেন। তিনি যে সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, রাজকীয় রাজস্ববাদে, তাহার আয় বর্ত্তমানে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। ইহার কতকাংশ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং অবশিষ্ট অংশ মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষার সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইতেছে।

তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে আজ মুসলমান সমাজে শিক্ষার পথ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহারই অর্থসাহায্যে মুসলমান যুবকবৃন্দ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার এক অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব, অতুলনীয় দানশীলতা মহসীনকে এই মর্ত্ত্য জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। এই নশ্বর জগতে ইহাই তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তিচিহ্ন। কে বলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে? আজিও তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ে গৌরবাসনে সমাসীন—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'।



ডেভিড হেয়ার

# লোকশিক্ষা-বিস্তারে
# ডেভিড হেয়ার।

"অভেদ খৃষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান্ ,
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়ের সন্তান।"

—মানকুমারী।

কলিকাতার শিক্ষার ইতিহাসে হেয়ার সাহেবের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। শিক্ষাবিস্তারকল্পে স্বার্থত্যাগের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতে অতি বিরল। বিদেশী এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বঙ্গদেশবাসীকে তিনি যেরূপ অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এ দেশের কোন লোক তাহার দেশবাসীকে সে চক্ষে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। ডেভিড হেয়ার চিরকুমারব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়টুকু দিয়া বঙ্গদেশকে ভালবাসিয়াছিলেন; বঙ্গদেশবাসীর কল্যাণচিন্তা ভিন্ন সে হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পায় নাই। তাঁহার উদার চিত্ত ভৌগলিক, সামাজিক প্রভৃতি সসীম বন্ধন ছিন্ন করিয়া সেই অসীম, অনন্ত প্রেমরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিল। তাই, নিজ দেশ, নিজ জাতি, নিজ সমাজ, এমন কি আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির কথা বিস্মৃত হইয়া, বিশ্বপ্রেমিক হেয়ার একমনে, একপ্রাণে এ দেশের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক হেয়ার অর্থসঞ্চয়মানসে কলিকাতায় আগমন করেন, এবং স্বীয় পরিশ্রম, সততা ও বুদ্ধি বলে অত্যল্পকালমধ্যেই ঘড়ির ব্যবসায়দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তখন ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; সুতরাং ইচ্ছা করিলে তিনি অপরিমিত ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া বিলাসবিভবে সুখে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু পার্থিব সুখসম্পদে তৃপ্ত না হইয়া, তাঁহার মন উচ্চতর সুখের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। স্বার্থসম্পর্কচিন্তাবিহীন হইয়া পরসেবায় স্বীয় ধনমনপ্রাণ নিয়োগ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জ্ঞানালোকবিরহিত কুসংস্কারাপন্ন কলিকাতাবাসী জনসাধারণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রেমপারাবার উথলিয়া উঠিল। উহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাত দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের প্রাসাদোপম গৃহ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। কলিকাতাবাসী ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান সকলেই সেই মহান্দোলনের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেয়ার স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শিক্ষাপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কলিকাতায় শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রকৃত বিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ বিদ্যালয় কলিকাতা নগরীতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজিশিক্ষা প্রচলনের জন্য নূতন নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে রীতিমত শিক্ষা প্রদত্ত হইত না। কতকগুলি ইংরাজি শব্দ আয়ত্ত করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে কথা বলিতে পারিলেই যুবকগণ নিজদিগকে সুশিক্ষিত ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত।

বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অক্ষরযোজনা, সংখ্যালিখন ও সামান্যরূপ গণনা শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রগণের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিত না। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান বা নৈতিক জ্ঞান

সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষারই বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং বালকের চিত্তবৃত্তি-বিকাশ—যাহা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—তাহা অসম্পন্ন থাকিয়া যাইত। ভাষায় তাহার কোন অধিকার জন্মিত না বলিয়া সে শুদ্ধ করিয়া সামান্য একটি প্রবন্ধ পর্য্যন্ত লিখিতে পারিত না; এমন কি ছোট ছোট বাক্য পর্য্যন্ত বর্ণাশুদ্ধি দোষে পরিপূর্ণ থাকিত। ব্যাকরণের নিয়ম পালন করাতো দূরের কথা—একটি শব্দেরই বানান লেখকের ইচ্ছানুসারে বহুরূপ ধারণ করিত। যাঁহারা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন তাঁহারাও পার্শিশব্দবহুল দুর্ব্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করিতেন। মাতৃ-ভাষার এরূপ অধোগতি এই উন্নতির যুগে দুর্ভাগ্য ভারত ব্যতীত পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মাতৃ-ভাষাশিক্ষাই মানসিক উৎকর্ষসাধনের প্রথম স্তর। সেই শিক্ষা ব্যতিরেকে যখন বঙ্গের জনসাধারণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য একজন বিদেশাগত ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন। ইহা কি তাঁহার মহাপ্রাণতার সমুজ্জ্বল পরিচয় নহে?

বিশ্বপ্রেমিক হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষাপ্রচারের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণচেতা সমালোচক, হয়ত, এই দেশে তাঁহার স্বদেশের ভাষা-প্রচারের একটি আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বঙ্গদেশে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা-প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে যে স্বার্থের লেশমাত্র নাই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ ডেভিড হেয়ার কোন দেশবিদেশের বা জাতি-বিশেষের গৌরববর্দ্ধনার্থ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশ্বমানবের সেবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং দেশকাল ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ভারতে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

দেশীয় পাঠশালায় শিক্ষাপ্রণালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া হেয়ার বিস্মিত

হইলেন। বঙ্গীয় ছাত্রবর্গের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে তিনি কখনও সন্দিহান ছিলেন না। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, পাঠশালায় শিক্ষা-প্রদানের সুবন্দোবস্ত হইলেই, ছাত্রগণ যথেষ্ট মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। তাই তিনি নিজের ব্যয়ে ঠন্‌ঠনিয়ায় কালীতলার নিকট একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সেখানে তিনি নবোদ্ভাবিত উন্নত প্রণালীতে হিন্দু বালকগণের মানসিক উৎকর্ষবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। কোমলমতি বালকগণের উপযোগী পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচারের জন্য তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বঙ্গভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিবার ও পড়িবার সুবন্দোবস্ত হইল। বহু বালক ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইল। শিক্ষায় তাহাদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ এবং নিয়মিতরূপে পাঠশালায় উপস্থিতির জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে গুণানুসারে পুরস্কার বিতরণ করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ার বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পণ্ডিতদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যান্য পাঠশালার শিক্ষকগণের সমক্ষে তাহাদের উন্নত শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যে সকল গুরুমহাশয় উন্নত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

এই সময়ে কলিকাতায় সুপরিচালিত বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। এই অভাব দূরীকরণার্থ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় দেশীয় ও য়ুরোপীয় গণ্যমান্য লোক লইয়া "স্কুল বুক সোসাইটি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পরবৎসর দেশীয় যুবকগণের মধ্যে সুশিক্ষা বিতরণের উদ্দেশ্যে এবং মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক উন্নতিবিধানকল্পে, তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কলিকাতায়

কতিপয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "স্কুল সোসাইটি" নামে অপর একটি সমিতি গঠিত হয়। নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের সংস্কারসাধন এবং প্রতিভাসম্পন্ন যুবকগণের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান—এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানবিস্তারকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে হেয়ার সাহেব যোগদান না করিয়া কি থাকিতে পারেন? তিনি এই উভয় অনুষ্ঠানের একজন উৎসাহী কর্ম্মকুশল সভ্য—বিশেষতঃ তিনিই কলিকাতার স্কুল সোসাইটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

এই সমিতি কলিকাতার জনবহুল বিভিন্ন পল্লীতে চারিটি বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। আরপুলিতে যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হেয়ার সাহেবের অনুরোধে তাঁহারই হস্তে অর্পিত হয়। এই বিদ্যালয়টি নিজহস্তে গ্রহণব্যাপারে হেয়ার সাহেবের একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। যে সকল বালক তাহাদের পিতার দরিদ্রতানিবন্ধন শিক্ষাভাবে হীন জীবন যাপন করিত, তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দরিদ্রবৎসল হেয়ার দরিদ্রের সেবার জন্য এই বিদ্যামন্দিরের "সেবাইত" নিযুক্ত হইলেন এবং নিজব্যয়ে আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বঙ্গের খ্যাতনামা সুকৃতী সন্তান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই আরপুলি পাঠশালার গৃহতলে উপবেশন করিয়া কদলী-পত্রে লিখন অভ্যাস করেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই পাঠশালার নিকট একটি ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালার মেধাবী ছাত্রগণ এই ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পাইত, এবং এই প্রাথমিক ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ পরে হেয়ার সাহেবের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। কিন্তু বাঙ্গালা

ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ না করিয়া ছাত্রগণ যাহাতে পাঠশালা হইতে ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি হেয়ার সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যে সকল বালক ইংরাজি স্কুলে প্রবেশের অনুমতি পাইত তাহাদিগকেও ভোরে এবং বিকালে সেই পাঠশালায় বাঙ্গালা অধ্যয়ন করিতে হইত। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বালকদের হৃদয়ে যাহাতে অবজ্ঞার সঞ্চার না হয়, তাহার জন্যই এইরূপ বিধান করা হইয়াছিল। ইহা কি হেয়ার সাহেবের দূরদর্শিতা ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগের পরিচয় নহে? এইরূপে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও অকাতর অর্থানুকূল্যে আরপুলি বিদ্যালয় কলিকাতায় আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও এই বিদ্যালয়ে তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিয়া ইহার প্রতি সহানুভূতি ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আরপুলি বিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের সুখ্যাতি দিন দিন কলিকাতায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশে উচ্চ ইংরাজিশিক্ষা প্রচারের জন্য হেয়ার সাহেব যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। কলিকাতায় যে স্কুলটি হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ, যে বিদ্যালয়ে পণ্ডিতপ্রবর রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, স্যার গুরুদাস, স্যার দেবপ্রসাদ, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার বিনোদচন্দ্রপ্রমুখ বঙ্গের খ্যাতনামা সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহার মূলভিত্তি হেয়ার সাহেব স্থাপন করেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাব্যাপারেও তিনি সাহায্যের ত্রুটি করেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সোমবার গরাণহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের সূচনা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যেও ইহার জন্য কোনরূপ স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। অবশেষে বিভিন্ন স্থান পরিবর্ত্তনের পর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কৃতকলেজের সঙ্গে ইহার জন্য এক গৃহ

নির্ম্মিত হয়। ডেভিড হেয়ার কলেজ স্কোয়ারের উত্তর পার্শ্বস্থ ভূভাগ হিন্দু কলেজের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য দান করেন।

হিন্দু কলেজের সূচনাকালে যে কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে হেয়ার সাহেবের নাম না থাকায়, কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের সংস্থাপক-আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু হেয়ার সাহেবের পরামর্শেই রামমোহন রায়, বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি প্রভৃতি দেশীয় নেতৃবর্গ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার হাইড ইষ্টের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। সুতরাং হিন্দু কলেজের প্রথম কমিটিতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে না পাওয়া গেলেও, পরোক্ষভাবে তিনিই যে দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে যে সকল য়ুরোপীয় ভদ্রলোক যথেষ্ট সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ডেভিড হেয়ার তাহাদের অন্যতম। কিন্তু তিনি নামের প্রত্যাশী না হইয়া স্বভাবতঃ নীরবে কর্ম্ম করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহার নাম পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

বস্তুতঃ হেয়ার সাহেব মানবজাতির দীন সেবকরূপে তাঁহার জীবনের নীরব সাধনা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ কর্ম্মী জগতে বিরল। ভোর দশটার সময় নানাপ্রকার পুস্তক ও ঔষধে তাঁহার পাল্কী বোঝাই করিয়া, তিনি তাঁহার দৈনিক কার্য্যে বহির্গত হইতেন। সমস্ত দিন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। শেষ বয়সে হিন্দু কলেজ, পটলডাঙ্গা বিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ,—এই তিনটি বিদ্যালয় তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া উঠিল। বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম রেজেষ্ট্রী দেখিয়া যে যে ছাত্র অনুপস্থিত আছে, তাহাদের নামের একটি তালিকা করিতেন। তারপর বিভিন্ন শ্রেণীতে যাইয়া ছাত্রদের পাঠোন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও

শিক্ষকদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং মেধাবী ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিয়া, অলস ও অমনোযোগী ছাত্রদিগকে তিরস্কার করিয়া, পাঠে উৎসাহিত করিতেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনকার্য্য সমাপ্ত হইলে, যে সকল ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত থাকিত, তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইতেন। গৃহে বালকদের আচারব্যবহার কিরূপ, তাহারা কিরূপ লোকের সংসর্গে বাস করে, কিরূপ ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করে, অধ্যয়নে উপযুক্ত সময় ক্ষেপণ করে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয় তিনি অনুসন্ধান করিতেন। মানসিক উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে বালকদের চরিত্রগঠন তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি বালকদের সঙ্গে খুব মেশামিশি করিতেন। শুধু বিদ্যালয়গৃহে নয়, ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে এবং পথেঘাটেও প্রায়ই তিনি বালকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে ছাত্রদের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাঁহার ছাত্রগণই দেশের সামাজিক শাসন ও দণ্ডভয় তুচ্ছ করিয়া অগ্রণীরূপে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বঙ্গদেশে ডাক্তারি শিক্ষার এক নবযুগ আনয়ন করে।

হেয়ার সাহেব ছাত্রদের চরিত্র-সংশোধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহাদের নৈতিক অবনতির কারণ অধিকক্ষণ তাঁহার নিকট গুপ্ত থাকিতে পারিত না; শীঘ্রই তিনি তাহা ধরিয়া ফেলিতেন। যে বালক মোহে পতিত হইয়া চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে তাহার ভ্রম নিরসন করিয়া, যাহার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছে তাহার সন্দেহ অপনোদন করিয়া, যে বালক তাহার চরিত্র-সংশোধনে একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, আশ্বাসবাক্যে তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া—এক কথায় যে রোগের যে ঔষধ তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া, তিনি পথভ্রান্ত যুবকদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেন। যুবকগণ যাহাতে

সর্ব্বদা ন্যায়পথে থাকিয়া সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং সেই সত্যস্বরূপের মহিমা ঘোষণা করিয়া ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, সেইজন্য তিনি সমস্ত জীবন অশ্রান্ত অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কর্ম্মই ধর্ম্ম—ইহা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাই তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পরসেবায় সমস্ত ধন, মন ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছিলেন। বিদ্যার্থী কত নিঃস্ব বালককে তিনি অর্থদ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, কত দরিদ্র বালকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় তিনি নিজে বহন করিয়াছেন, কত অভাবগ্রস্ত বালককে তিনি নিজব্যয়ে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কত দরিদ্র ছাত্রের রোগ-শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তিনি নিজহস্তে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়াছেন, কত দুঃস্থ পরিবারের শিক্ষিত যুবককে চাকুরীর সংস্থান করিয়া দিয়া দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

এই উদারহৃদয় মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থ আড়ম্বরপ্রিয় বাঙ্গালী অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত ও হেয়ারস্কুলপ্রাঙ্গণে মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং বিদ্যালয়গৃহে প্রস্তরফলকে তাঁহার প্রশংসালিপি খোদিত ও তৈলচিত্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু হেয়ারের অন্তরাত্মা ইহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াছে কি? হেয়ারের আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির জন্য বঙ্গবাসী কোনও অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছে কি? হেয়ারের আত্মা যে এখনও দরিদ্র অজ্ঞ জন-সাধারণের পল্লীতে পল্লীতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার আত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ বঙ্গবাসী কি দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে

শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে অগ্রসর হইবে না? বঙ্গবাসীকে আর বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে—

"এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে
হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা।"

# কারা-সংস্কারে

# হাওয়ার্ড।

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথায় কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী' পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥"

—কামিনী রায়।

মহাপ্রাণ জন হাওয়ার্ড লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু য়ুরোপে তাঁহার নাম না জানে এরূপ লোক অতি বিরল। কয়েদীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে যে করুণ-সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, সেই এক সুরই তাঁহার প্রাণে আমরণ বাজিতেছিল। তিনি সমাজসেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই য়ুরোপীয় জনসমাজ এখনও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার চরণতলে মস্তক অবনত করিতেছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে কারাগারের অবস্থা অতীব শোচনীয়

ছিল। কারাগৃহগুলি একদিকে যেরূপ অপ্রশস্ত ও গবাক্ষবিহীন, অপর দিকে সেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। তথায় সূর্য্যালোক-প্রবেশের বা বায়ু-চলাচলের পথ একপ্রকার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধূলি, আবর্জ্জনা ও পূতিগন্ধময় দ্রব্যে কারাগৃহগুলি এরূপ পরিপূর্ণ থাকিত যে, এমন কি য়ূরোপের তদানীন্তন পশুশালার অবস্থাও তদপেক্ষা ভাল ছিল। জেলরক্ষকদের কোনরূপ নিরূপিত বেতন ছিল না। তাহারা কয়েদীগণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করিত। এইরূপে যাহারা রক্ষক তাহারাই আবার ভক্ষকমূর্ত্তি ধারণ করিত। তাহাদের অব্যাহত শক্তি সময় সময় স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারে পরিণত হইয়া কারারুদ্ধ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের ক্লেশ ও যাতনার বৃদ্ধিসাধন করিত।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কোমলমতি বালকগণ জেলখানায় নরাধম, দুর্ব্বৃত্তগণের সঙ্গে একগৃহে রক্ষিত হইত। তাহারা এইরূপে তাহাদের চরিত্রকে দিন দিন আরও কলুষিত করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইত। তখন অপরাধের গুরুত্ব বা লঘুত্বে, বয়সের আধিক্য বা অল্পতায়, অথবা স্ত্রীপুরুষ-ভেদে কয়েদীদিগকে বিভাগ করিয়া রাখিবার প্রথা ছিল না। কাজেই কারাগৃহের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাক, বরং বিপরীত ফলই প্রসূত হইত। বালকগণের চরিত্রসংশোধনের কোন চেষ্টাই হইত না, পক্ষান্তরে চরিত্র নষ্ট করিবার সুযোগ তাহাদের নিকট প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইত।

কারাবাসীদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের যথোপযুক্ত বিধান ছিল না। আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ শরীররক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। আবার তাহাদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার উপর জেলরক্ষকদের লোলুপ দৃষ্টি থাকায় অনেক কয়েদীকেই অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায়

থাকিতে হইত। কারাপ্রবেশকালে যাহারা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম থাকিত, মুক্তিকালে তাহারাই রুগ্ন, কঙ্কালসার ও কর্ম্মশক্তিরহিত হইয়া বাহির হইত। কোন কোন জেলে পানীয় জলেরও সংস্থান ছিল না। কাজেই অনেক সময় হতভাগ্য কয়েদীগণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর্ত্তনাদ করিত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ পনর ঘণ্টা সময় কয়েদীগণ অপ্রশস্ত কারা-গৃহে অথবা বায়ু ও আলোক বিহীন মৃত্তিকানিম্নস্থিত গহ্বরে আবদ্ধ থাকিত। সেই সকল স্থানের ভীষণ দৃশ্য কল্পনা করিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। অন্ধকূপ-হত্যার ন্যায় একরাত্রিতে অত লোকের প্রাণ নষ্ট হইত না সত্য, কিন্তু তিল তিল করিয়া সেই দুর্ভাগ্যদের জীবনী শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এরূপ উদাসীনতার কুফল প্রতি জেলেই পরিলক্ষিত হইত। কারাজ্বর নামে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি কারাবাসিগণের সমক্ষে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইত। তাহার ভীষণ আক্রমণে জেলকে জেল উজাড় হইয়া যাইত; অতি অল্পমাত্র লোকই তাহার করাল-কবল হইতে রক্ষা পাইত। কোনও কোনও সময় জেলরক্ষক ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রাণনাশকর রোগের ভীষণ আক্রমণে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। তৎকালে প্রতিবৎসর ঘাতকের হস্তে যত লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইত, এই উৎকট রোগে তদপেক্ষা অধিক লোক শমনসদনে গমন করিত।

কারাবাসিগণের এরূপ দুর্দ্দশার দিনে, ইংলণ্ডে যখন পরসেবার ভাব সঞ্জাত হয় নাই, যখন সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে ন্যায়াধিকারে বঞ্চিত করিয়া পদদলিত করিবার হীন আকাঙ্ক্ষা সমাজহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, সমাজশক্তিকে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত ও উন্নত করিয়া তুলিতে যখন কেহই অগ্রসর হয় নাই, সমাজের ক্ষমতালোলুপ আভিজাত্য-

বর্গ যখন জনসাধারণের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু নিজ নিজ বংশগরিমায় গর্ব্বিত, ধনমদে মত্ত, এবং রূপজমোহে ও বিলাসব্যসনে নিমগ্ন; ইংলণ্ডের সেই দুর্দ্দশার দিনে, এক মহানুভব, ক্ষণজন্মা, দেবোপম পুরুষের আবির্ভাব হইল।

হাওয়ার্ডের স্বভাবকোমল উদার হৃদয় কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের দুঃখদুর্গতি ও লাঞ্ছনাগঞ্জনার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিগলিত হইল। ঘৃণিত, দলিত, পশুবৎ আচরিত, ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবমণ্ডলীর উদ্ধারসাধনে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সংকল্পসাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্নসহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

জন হাওয়ার্ড য়ুরোপের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি কারাগৃহে ঘুরিয়া কারাবাসীদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ও তাহাদের করুণ কাহিনী স্বকর্ণে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দশবৎসরকাল তিনি এইরূপে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের জেল পরিদর্শন করিলেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, পথশ্রমে ভ্রূক্ষেপ নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, এক লক্ষ্য, এক ব্রত, এক সাধনা। তাঁহার সঙ্গে একজন মাত্র অনুচর ছিল। তিনি প্রতিদিন অশ্বারোহণে চল্লিশমাইল পথ অতিক্রম করিতেন। দিবাশেষে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কোনও সহরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সেখানে সামান্য রুটি ও দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন—মদ্যমাংস কখনও স্পর্শ করিতেন না।

এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া মহাপ্রাণ হাওয়ার্ড কারাগৃহসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। জেলরক্ষকদের অনধিগম্য অন্ধতমসাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় কারাগৃহেও তিনি সানন্দ ও স্বচ্ছন্দচিত্তে গমন করিতেন। হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার

জন্য তিনি নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগের আবাসস্থলেও গমন করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি জানিতেন যে এরূপ কার্য্যে তাঁহার জীবন সদা সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু পরদুঃখমোচন যাহার জীবনের ব্রত, তাঁহার আবার মৃত্যুভয় কোথায়? তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কারাগৃহের দুরবস্থা মোচনের জন্যই বিধাতা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই হওয়ার্ডের প্রতি বাক্যে ও কর্ম্মে ঈশ্বরবিশ্বাসের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলেন,—"আমি যাহা কিছু করিয়াছি, সমস্তই ভগবানের আদেশে করিয়াছি। আমি যতই দুর্ব্বল ও সামান্য হইনা কেন, সেই প্রেমময় বিশ্বপতি আমাদ্বারা জগতে ইহাই প্রচার করিতেছেন যে, তিনি সর্ব্বদা তাঁহার সৃষ্ট জীবের দুঃখমোচনে ব্যগ্র।"

হাওয়ার্ড কারাগৃহ পরিদর্শনান্তে কারাকাহিনীসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থকাররূপে যশ উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে একার্য্যে প্রণোদিত করে নাই। কারাবাসিগণের দুর্দ্দশার করুণকাহিনী প্রচার করিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল। তাহাদের দুর্দ্দশামোচনার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল। কৃপাপাত্র কারাবাসীদিগের প্রতি সহানুভূতির ভাব মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। তাঁহার অবিরাম যত্ন, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনায়, য়ুরোপীয় সমাজ কারাগৃহ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তৎসাধনে যত্নপর হইল।

কোন রাজা বা সম্রাটের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় নির্ভীকহৃদয় হাওয়ার্ড কারাগারের শোচনীয় কাহিনী বর্ণনা করিতে বিরত হন নাই। অষ্ট্রীয়ায় ভ্রমণকালে উত্তর অষ্ট্রীয়ার শাসনকর্ত্তা ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে একবার তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। সেই উচ্চবংশজাত শাসনকর্ত্তা

গর্ব্বভরে হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার রাজ্যের কারাগৃহ সম্বন্ধে আপনার মত কি?" স্বাধীনচেতা স্পষ্টবক্তা হাওয়ার্ড উত্তর করিলেন, "জর্ম্মণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। কারাগারসমূহের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার পত্নীকে স্বচক্ষে ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি।" সেই শাসকপত্নী বিস্মিত হইয়া দম্ভভরে উত্তর করিলেন, "আমি! আমি কারাগৃহে যাব?" এই বলিয়া তিনি সদর্প পাদবিক্ষেপে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বসেবক হাওয়ার্ড মহিলার উক্তরূপ গর্ব্বিত বাক্যে ও উদ্ধত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে বলিলেন, "মহোদয়ে, স্মরণ রাখিবেন আপনি একজন স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছু নন। মৃত্তিকাগর্ভে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হতভাগ্য স্ত্রীলোদিগের ন্যায়, আপনিও অচিরে মৃত্তিকাশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আপনার বিলাস-বেশসজ্জিত দেহ ও কারাবাসিনীর ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দেহ এক মৃত্তিকায়ই লয়প্রাপ্ত হইবে।"

পরমেশ্বরের বিধান রহস্যময় ও মানববুদ্ধির অতীত। যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অবশেষে উহাই তাঁহার জীবনের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হাসপাতালের অবস্থা পরিদর্শনোদ্দেশ্যে হল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, প্রুশিয়া ও রুশিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার অন্তর্গত নীপার নদীর মোহনায় চার্সন্ নামক স্থানে উপনীত হন। সে স্থানের ক-হাসপাতাল পরিদর্শনকালে তিনি দুষ্টজ্বর রোগে আক্রান্ত হন এবং এরূপ জ্বরোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া সেই বৎসরের ২০শে জানুয়ারী নশ্বর করিতে লাগিয়োগ করিয়া অমরধামে গমন করেন। রুগ্নাবস্থায়ও তাঁহার চির কারাগৃহেও ঈশ্বরনির্ভরতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তাঁহার জনৈক বন্ধু রোগীদের চিকিৎরোগশয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ আশ্বাস-

বাক্যে সান্ত্বনা দান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তিনি ধীরভাবে উত্তর করেন, "প্রিষ্টম্যান, আমার আসন্ন মৃত্যুসম্বন্ধে কথোপকথন করাকে তুমি অপ্রীতিকর বিষয় বলিয়া মনে করিতেছ এবং আমার মন অন্যদিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু আমি ইহাকে মোটেই অপ্রীতিকর মনে করিনা। মরিতে আমার বিন্দুমাত্রও ভয় নাই, ববং আমি মৃত্যুকে সানন্দচিত্তে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।"

স্থিরপ্রতিজ্ঞ অক্লান্তকর্ম্মা হাওয়ার্ড স্বীয় লক্ষ্যসাধনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। আহারেবিহারে, শয়নেস্বপনে, দেশেবিদেশে, সর্ব্বত্র তাঁহার সেই এক লক্ষ্য, এক সাধনা। একবার তিনি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ইটালীদেশে একস্থানে সঙ্গীত শ্রবণ উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেই প্রাণোন্মাদক সুমধুর সঙ্গীতধ্বনিতে সকলেই বিমোহিত হন, সেই সুমিষ্ট তানলয়বিশিষ্ট সঙ্গীত সকলের কর্ণেই পীযূষধারা বর্ষণ করে। হাওয়ার্ডের মনের এককোণে সেই সঙ্গীতচিন্তা অলক্ষিতে প্রবেশ লাভ করিল। কিন্তু অচিরে তিনি তাঁহার দুর্ব্বলতা ধরিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি আর কখনও সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন না। লক্ষ্যসাধনের চিন্তা যাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সেই অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হাওয়ার্ডের চিত্তে সঙ্গীতচিন্তা কি স্থান পাইতে পারে? তিনি এইরূপে সকল প্রকার আমোদপ্রমোদ ও সুখভোগ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিয়া লোকহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন—কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। ধন্য হাওয়ার্ড! ধন্য তাঁহার সাধনা!

আর্ত্তের দুর্দ্দশা-মোচনে

# এলিজাবেথ ফ্রাই।

"আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি
আমাদের শত্রু মিত্র নাই :
বরিষার ধারা সম অজস্র জননীপ্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।"

মহাপ্রাণ হাওয়ার্ড যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন. তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, বিধাতার দুর্জ্জেয় ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইল। ইংলণ্ডের মহাকাশ হইতে একটি সমুজ্জ্বল তারকা অন্তর্হিত হইল। য়ুরোপীয় সমাজের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে, আবার অন্ধকারের করাল ছায়া পতিত হইল। য়ুরোপে কর্ম্মের যে দুন্দুভি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া সুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল, অসাড় নির্জীব জীবনে প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়াছিল, তাহা হঠাৎ নীরব হইল।

এইরূপ সময়ে হাওয়ার্ডের আরব্ধ কার্য্য পরিসমাপ্তির মুখে লইয়া যাইবার জন্যই যেন, বিধাতার শুভ ইচ্ছায়, ইংলণ্ডে একটি রমণীরত্নের আবির্ভাব হইল। ইনি এলিজাবেথ ফ্রাই নামে পরিচিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নরউয়িচ নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ ফ্রাই বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। আত্মোন্নতি ও পরিহত-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। জীবনের প্রথম ভাগেই স্বীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধনার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।



এলিজাবেথ ফ্রাই

পণ্ডিত-প্রবর সক্রেটিসের মহামূল্য উপদেশ-বাক্য অনুসরণ করিয়া জীবনের পূর্ব্বাহ্ণেই তিনি নিজের আত্মার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়-স্থাপনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অকপটচিত্তে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বকীয় চরিত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি উহার দোষসমূহ সংশোধনে নিযুক্ত হইলেন। নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতাসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অনেক সময় নিজেই লজ্জিত হইতেন। এলিজাবেথ ফ্রাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি রিপুপরতন্ত্র হইয়া জীবন কাটাইতেছি; ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আমার কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। তাহারাই আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আমি ইহা জানিতে পারিয়াও নিজেকে বশে রাখিতে পারিতেছি না; আমার চরিত্রসংশোধনের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।" পরক্ষণে তিনি প্রকৃত বীররমণীর ন্যায় সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবার জন্য রণচণ্ডীর দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, "আমি কখনও চপলতা প্রদর্শন করিব না, কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না, অতিরঞ্জন প্রভৃতি দোষ হইতে সদা বিমুক্ত থাকিব; আমি কখনও বিলাসিতার প্রশ্রয় দিব না, কখনও অলস চিন্তার আশ্রয় লইব না; কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সদ্বৃত্তিদ্বারা হৃদয়কে সুশোভিত করিব; অযথা রহস্য বা কৌতুক করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দিব না।"

ধর্ম্মই মানব-জীবনের সার রত্ন। ইহাই মানুষকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই মানব জগতের হিতানুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় ও বরণীয় হয় এবং অনাবিল আনন্দস্রোতে ভাসিতে থাকে। জীবনের উষাকালেই এলিজাবেথের হৃদয় ধর্ম্মের এই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা বা নৃত্যগীতাদি তরল আমোদপ্রমোদ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন না। ধর্ম্মচিন্তা,

পরসেবা প্রভৃতি উদার-ভাবরাজি তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইবেন, কি উপায়ে তিনি তাঁহার শক্তি-সামর্থ্য দেশের ও দশের কাজে নিয়োগ করিয়া জীবন ধন্য করিবেন, তাহাই তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয় হইল।

হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আবার পূর্ব্বাকার ধারণ করিল। কারাবাসিগণের উপর নৃশংস ও অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল; তাহাদের আর কষ্টের সীমা রহিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রেটব্রিটনে যে সকল কারাগার ছিল, অপরাধের তারতম্য না করিয়া তথায় সকল অপরাধীকে এক সঙ্গে রাখা হইত। কারাগারে নানাপ্রকার ব্যাধি ও সংক্রামক-রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কারাগারগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার কোন চেষ্টা হইত না। সুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে একত্রই রাখা হইত। ইহারই ফলে শত শত কারারুদ্ধ ব্যক্তি অকালে কালের করালগ্রাসে পতিত হইত। জেলের রক্ষকগণ অতি নির্দ্দয়প্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের চরিত্রে সাধুতার লেশমাত্র ছিল না। অর্থলালসা-প্রণোদিত হইয়া তাহারা কারাবাসিগণের নিকট হইতেও উৎকোচ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। যাহারা তাহাদের মনস্তুষ্টিসাধনে অসমর্থ হইত, নিরপরাধ সাব্যস্ত হইলেও তাহারা জেল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত না।

কোন কোন কারাগার এমন জীর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে কয়েদীগণ অবলীলাক্রমে কারাগৃহ হইতে পলায়ন করিতে পারিত। এই জন্য তাহাদিগকে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলের সাহায্যে স্থূল কাষ্ঠ-খণ্ডে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কখনও কখনও লৌহশলাকাদ্বারাও

অতীব নির্ম্মমভাবে তাহাদের উপর উৎপীড়ন করা হইত। অধিকাংশ কারাগারই মূষিকের আবাসভূমি ছিল; আবার সেই ক্ষুদ্র জীবগুলির এতই দুঃসাহস যে, অনেক সময় তাহারা নিদ্রিত কারাবাসিগণের বদনমণ্ডল দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত। সুতরাং কারাবাসীদিগকে সেখানে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে রাত্রি যাপন করিতে হইত।

কোন কোন জেলের কারাকক্ষগুলি মৃত্তিকার অনেক নীচে অবস্থিত ছিল। তাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশের পথ ছিল না; এমন কি দিন-মানেও তথায় ভীষণ অন্ধকার বিরাট দৈত্যের মত বিরাজ করিত। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আর্দ্র কক্ষ মধ্যে ভূমির উপর কারাবাসিগণকে শয়ন করিতে হইত। কোন কোন জেলে কয়েদীগণকে পরিমিত আহার পর্য্যন্ত প্রদান করা হইত না; অর্দ্ধাশনে বা অনশনে তাহারা দিনপাত করিত। এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত তাহারা মদ্যাদি পান করিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিত। জেলে কোনও দানশীল ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, কয়েদীগণ তাঁহাদের নিকট হইতে যে অর্থ পাইত তাহাতে মদ্য প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ক্রয় করিত। এমন কি, জেলখানার তত্ত্বাবধায়কগণও তাহাদের এই পাপাচরণে প্রশ্রয় প্রদান করিত। তাহারা প্রকাশ্যভাবে কয়েদীগণের নিকট মদ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না।

জেলখানায় কয়েদীদিগকে অপরাধের তারতম্য বা বয়সের অল্পাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন স্থানে রাখা হইত না। ভ্রান্তমতি অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অনেক সময় ঘোর দুষ্ক্রিয়াসক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেষপালের ন্যায় এক সঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এইরূপে বালকদের চরিত্র-সংস্কারের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না, বরং তাহারা দিন দিন পাপের পথে অগ্রসর হইত।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ অনেক সময় পরস্পর মারামারি করিত। অনেক সময় তাহারা জানালার ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া দিয়া পথিকের অঙ্গ হইতে শিথিল বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইত। রক্ষকগণ ইহাতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিত না, বরং আনন্দ অনুভব করিত। একদিন একজন শাসনকর্ত্তা অরক্ষিত অবস্থায় স্ত্রীলোকদের জেল পরিদর্শনের জন্য গমন করেন। কয়েদীগণের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার পরিহিত বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় তাহাদিগের দিকে শূন্য অথচ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা এতই দুর্দ্দান্ত ছিল যে, ধর্ম্মযাজকও তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেন না, জানালা হইতে দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার দৈনিক উপাসনা-কার্য্য সমাধা করিতেন।

যখন ইংলণ্ডের কারাগার-সমূহের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন এলিজাবেথ একদিন এক কারাগারের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন শীতকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দারুণ শীতের কন্‌কনে হাওয়া গায়ে কাঁটা ফুটাইতেছে। কারাগারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল বন্দী পাথর ভাঙ্গিতেছে। এই দারুণ শীতেও তাহাদের গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের মুখ বিবর্ণ; দেহ অস্থি-কঙ্কালসার; মৃত্যুবিভীষিকা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত। এই করুণ দৃশ্য এলিজাবেথের নয়নপথে পতিত হইলে, তাঁহার দয়াপ্রবণ পরদুঃখকাতর হৃদয়ে স্নেহ-পারাবার উথলিয়া উঠিল। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখদুর্গতি-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভগ্নহৃদয়ে ও বিষণ্ণবদনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তদবধি কারারুদ্ধ শৃঙ্খলিত বন্দিগণের দুঃখমোচনচিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল।

তিনি স্বচক্ষে জেলখানার সমস্ত অবস্থা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। তাঁহার কুতুহল-চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন তদীয় পিতা তাঁহাকে লইয়া নর্‌উয়িচ-সংস্কার আশ্রমে গমন করেন। তথায় তিনি রমণীগণের যে ম্লান ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হ'ন নাই। নারীজীবনের যে এইরূপ হীন শোচনীয় পরিণতি ঘটিতে পারে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই লাঞ্ছিত ললনাগণের দুর্গতিমোচন ও উন্নতিবিধানের সহায়তাকল্পে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রশক্তিদ্বারা কি করিতে পারেন, তাহাই এখন তাহার চিন্তার বিষয় হইল।

কয়েক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। এলিজাবেথ নিজের জীবন কোন পথে পরিচালিত করিবেন, তাহা তখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ন্যাসীর সরল জীবন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। সমস্ত বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন এবং কৃষ্ণবর্ণের বসন, শ্বেতবর্ণের উত্তরীয় ও অবগুণ্ঠন প্রভৃতি সন্ন্যাসোচিত চিহ্ন ধারণ করিলেন।

এলিজাবেথের এই বৈরাগ্য-দর্শনে তাঁহার পিতা চিন্তান্বিত হইলেন। বিলাস-বৈভবপূর্ণ লণ্ডন-সহরের সম্মোহন চিত্র দেখাইয়া স্বীয় কন্যার মতি-গতি-পরিবর্ত্তন-মানসে তিনি তাঁহাকে লইয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে এলিজাবেথকে নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ দেখাইয়া বিলাসব্যসনের পথে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। হায়! অল্পবুদ্ধি মানব! তুমি অন্তর্মুখ, ঈশ্বরসাক্ষাৎকারপ্রয়াসী সাধু-সজ্জনকে পাপের লোভনীয় চিত্র দেখাইয়া বিপথগামী ও ধর্ম্মহীন করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? পুণ্যময় ধর্ম্মজীবনের প্রতি তুমি এত বিরাগভাব পোষণ কর কেন? জগতের ইতিহাসে সয়তানের এইরূপ প্রচেষ্টা বহুবার নিষ্ফল হইয়াছে; এবারও নিষ্ফল হইল। এলিজাবেথের দৃঢ়সংকল্প অটুট রহিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার নিকট পাপ-প্রলোভন পরাজয় স্বীকার

করিল। স্বকীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দীনদরিদ্রই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইল; তাহাদের দুঃখ-দুর্গতি-বিমোচনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিল।

প্রতিদিন তিনি প্রতিবেশী বালক-বালিকাকে সমবেত করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন যে, বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার শিক্ষা-কৌশল দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার নব-জীবনের সূচনা হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, মানবকুলের কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিবেন।

এলিজাবেথ্ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ফ্রাই-নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কিন্তু বিবাহবন্ধন তাঁহার পক্ষে মোহের বন্ধন হয় নাই। তিনি বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইয়া স্বকীয় জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি কখনও উদাসীনতা প্রদর্শন করেন নাই। সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, রোগক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সেবাকার্য্যে দ্বিগুণতর উৎসাহসহকারে অগ্রসর হইলেন। পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাঁহার হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। মানবকুলের দুর্দ্দশার চিত্র তাঁহার সম্মুখে যতই উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই তিনি তাহাদের দুঃখবিমোচনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন।

একদিন পথিপার্শ্বে তিনি একজন ভিখারিণীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। দুরন্ত শীতকাল; শীতবস্ত্রে গাত্র আবৃত করিয়াও এই

নিদারুণ শীতের প্রকোপ হইতে শরীর রক্ষা করা অসম্ভব। জীর্ণবসনা রমণী শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া এলিজাবেথের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নিজের দেহ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচন করিয়া শীতার্ত্ত রমণীকে দান করিলেন। আর একদিন সেই স্ত্রীলোকটি একটি রুগ্নশিশু ক্রোড়ে করিয়া পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। শিশুটি রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল; কিন্তু ভিখারিণীর সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে তাহার ভিক্ষালভ্য অর্থের জন্য লালায়িত। মাতৃহৃদয় যে কিরূপে এত কঠিন হইতে পারে, তাহা সন্তানবৎসলা এলিজাবেথ ফ্রাই বুঝিতে পারিলেন না। এই শিশু তবে কি এই ভিখারিণীর নিজের সন্তান নয়?—এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভিখারিণীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রশ্নের কোনরূপ সদুত্তর প্রদান না করিয়াই ভিখারিণী অন্তর্হিত হইল, এলিজাবেথের সন্দেহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি গোপনে সেই রমণীর অনুসরণ করিলেন।

সেখানে যাইয়া তিনি যে দৃশ্য অবলোকন করিলেন, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুমেয়। তিনি দেখিলেন, একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গহ্বরে দশ পনরটি শিশু মেষের ন্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে। রোগে ও অনাহারে তাহাদের দেহ কঙ্কালসার। এইরূপ অনাদৃত অবস্থায় চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে তাহারা দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তিনি আর তথায় মুহূর্ত্তকালও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার চিকিৎসকের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চিকিৎসককে সঙ্গে করিয়া পরদিন যখন তিনি সেস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে ভিখারিণী তাহার আশ্রিত শিশুগণসহ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

তখন শিশুপালন ইংলণ্ডে একটি ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

কঠোর জীবনসংগ্রামে কর্ম্মব্যস্ত নরনারী স্বীয় শিশুপালনের ভার কোনও বৃদ্ধার উপর ন্যস্ত করিয়া কলকারখানায় শ্রমজীবীর কার্য্যে রত থাকিত। সেই বৃদ্ধা শিশুদিগের মাতাপিতার নিকট হইতে তাহাদের প্রতিপালনব্যয়স্বরূপ কিছু কিছু অর্থ পাইত। অর্থোপার্জ্জনই সেই বৃদ্ধার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—সে শিশুদিগের জন্য কোনরূপ যত্ন লইত না। তাহার দুর্ব্যবহারে অনেক সময় শিশুগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু সে তাহা গোপন করিয়া শিশুদের জনকজননীর নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইত। এই সকল হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া এলিজাবেথের হৃদয়ে উত্তরোত্তর করুণার উদ্রেক হইতে লাগিল। তিনি নিঃস্ব দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের উপকার-সাধনে দৃঢ়সংকল্প হইয়া প্রকৃত বীররমণীর ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন।

এলিজাবেথ ফ্রাই দেশের যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। তিনি দেশের বিদ্যালয় প্রভৃতির সংস্কারসাধনে, শ্রমজীবীদিগের আবাসগৃহের উন্নতিবিধানে, দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে এবং খনির কার্য্যে ও কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের কষ্টলাঘব-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা একনিষ্ঠ সেবক জগতে অতি বিরল।

যখন যে অবস্থায় যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি কখনও দীনদরিদ্রের কথা বিস্মৃত হন নাই। এলিজাবেথ স্বামীর সহিত তাঁহাদের গ্রাম্য আবাসে অবস্থানকালে, প্রতিবেশিনী বালিকাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণার্থ একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। শীতার্ত্তকে শীতবস্ত্র, রোগগ্রস্তকে ঔষধ, নিরন্নকে অন্ন প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিবেশিনী-গণের চরিত্রের উন্নতি-বিধান করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য, তিনি তাহাদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করিতেন।

তাঁহার পল্লীবাটী হইতে প্রায় আধমাইল দূরে অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব পরিবার বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বহুলোক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তথাকার ধর্ম্মযাজক একাকী তাহাদের দুর্দ্দশামোচনে অসমর্থ হইয়া এলিজাবেথের সাহায্যপ্রার্থী হইল। সেবাধর্ম্মের একনিষ্ঠ-সেবিকা এলিজাবেথ তন্মুহূর্ত্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় লোকদিগের যন্ত্রণাদর্শনে এলিজাবেথের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে তিনি তাহাদের গৃহে গৃহে গমন করিয়া সকলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ও বসন্তরোগের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইয়া, কোথাও বা অনশনক্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিয়া, তাহাদের দুঃখ ও যন্ত্রণা লাঘব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও সেবায় অনেক লোক মহামারীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

এলিজাবেথের দয়া স্থানবিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার মাতৃহৃদয় সমভাবে সকলের জন্য ব্যাকুল হইত। একবার একদল ভ্রমণশীল অসভ্য জাতি তাঁহাদের গ্রামের ধারে পটবাস নির্ম্মাণ করে। তাহাদের একটি শিশু হঠাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে শিশুর অসহায় জনকজননী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। তখন সহসা তাহাদের মধ্যে একটি দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তিনি অসভ্যজাতীয় শিশুর শয্যাপার্শ্বে জননীর স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার যত্নে ও সেবাশুশ্রূষায় শিশুটি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল। সরলপ্রাণ অসভ্যজাতীয় লোকগণ কৃতজ্ঞতাভরে দেবীরূপা এলিজাবেথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে বহুবার তিনি দুঃস্থলোকের সাহায্য করিয়া তাঁহার মহানুভবতা ও সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য কারাসংস্কার। তিনি দেখিলেন হাওয়ার্ডের একাগ্র সাধনার ফলে য়ুরোপের কারাগারসমূহের যে সকল উন্নতি হইয়াছিল, হাওয়ার্ডের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সকল কারাগারের মধ্যে আবার ইংলণ্ডের কারাগারের অবস্থা আরও শোচনীয়। জেলখানায় অবরুদ্ধ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এরূপ দুঃখ-দুর্গতির কথা অবগত হইয়া এলিজাবেথের দয়াপ্রবণ হৃদয় স্বতঃই কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংলণ্ডের জেল সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। একবার তিনি লণ্ডন সহরের নিউগেট জেলখানায় যাইয়া উপস্থিত হন। তথাকার কয়েদীগণ এত দুর্দ্দান্ত ছিল যে, সেই জেলের তত্ত্বাবধায়ক তাঁহাকে কারাবাসিগণের সম্মুখে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে কারাগারের ভিতর প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি কারাগারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। স্বভাবকোমল স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত জেলখানার দুর্নীতির আব-হাওয়ায় তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,ঘোর দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বৃত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে। ঐ সকল স্ত্রীলোকদের অসংযত ব্যবহার, অশ্লীলভাষা, অশিষ্ট আচরণ দেখিয়া শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এলিজাবেথের সৌম্যমূর্ত্তি ও আড়ম্বরহীন বেশভূষা সেই দুর্ব্বৃত্ত কারাবাসিনীদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহারা হাটু গাড়িয়া বসিয়া নিঃশব্দে এলিজাবেথের উপদেশবাণী ও স্তোত্র-পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। এমন কি কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে অশ্রুধারাও বিগলিত হইল।

এলিজাবেথকে অনেক শোক, তাপ ও দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অনেক আত্মীয়স্বজন এমন কি প্রাণপ্রতিম পুত্রধন পর্য্যন্ত হারাইয়া-

ছিলেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁহাকে রোগের যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বিপদ্‌পাতে কখনও বিচলিত বা স্বীয় কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত না হইয়া তিনি কারাসংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

কঠোর শাসন ও শাস্তির বিভীষিকাময় লীলাস্থল না হইয়া, কারাগার যাহাতে চরিত্র-সংশোধন-কার্য্যে যথার্থ সহায়তা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত—এই ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এলিজাবেথ সহানুভূতিপূর্ণহৃদয়ে সর্ব্বদাই কারাসংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। নিউগেট কারাগারের হতভাগিনীদের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়িল। তিনি সময় সময় তথায় যাইয়া তাহাদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, কখনও বা তাহাদিগকে লইয়া সরলপ্রাণে প্রার্থনা, কখনও বা তাহাদের সন্তানদের রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাহাদের আত্মীয়স্থানীয়া হইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে সুনীতিপ্রচার দ্বারা দুর্নীতির স্রোত রুদ্ধ করিলেন।

সেখানে ক্রূরপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের উপর তিনি যে ভাবে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও দূর-দর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কারাবাসিনীদিগের অপেক্ষা তিনি তাহাদের সন্তানদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতেন। মাতৃহৃদয় যতই কলুষিত ও পাপাসক্ত হউক না কেন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাহাতে সর্ব্বদাই বিরাজ করে। তাই এলিজাবেথ ফ্রাই যখন কারাগারে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাদের সন্তানগণের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন তাহারা সকলে সাগ্রহে উহার অনুমোদন করিল। কিন্তু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ বিদ্যালয়-পরিচালন অসম্ভব। তাই তিনি একটি সমিতি গঠন করিলেন। নিউগেট কারাগারের স্ত্রীকয়েদীগণের চরিত্রসংশোধন ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-

বিধান এই সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তাঁহারা কারাবাসিনীদিগের বস্ত্রাভাব দূর করিতে এবং তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য এবং তাহাদের চরিত্রে মিতাচার, শ্রমশীলতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি প্রস্ফুট করিবার জন্য, এই সমিতির অধীনে নানা ভাবে নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এলিজাবেথ ফ্রাই নিজ ব্যয়ে কারাবাসিনীদিগকে পরিধেয় ও শীতবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন; তাহাদিগকে সর্ব্বদাই কোনও না কোন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন; এবং তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তাহাদের চা ও চিনি ক্রয় করিয়া দিতেন। কারাগারে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিত না। তাই এলিজাবেথ তাহাদের শয্যার জন্য মাদুর, ও শীত নিবারণের জন্য কম্বলের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে উপযুক্ত আহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের সংস্থান হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন।

এইরূপে এলিজাবেথের ঐকান্তিক যত্নে ও সেবায় অচিরেই কারাগারে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা, অশান্তির স্থানে শান্তি, দুর্নীতির স্থানে সুনীতি, শ্রমবিমুখতার স্থানে শ্রমানুরাগ, অমিতাচারের স্থানে মিতাচার ধীরে ধীরে অধিকার বিস্তার করিয়া কারাগারের নারকীয় বিভীষিকার অপনোদন করিতে লাগিল। সকলে বিস্ময়ের সহিত ইহা লক্ষ্য করিয়া এলিজাবেথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এলিজাবেথের যশঃ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; তাঁহার দেশবাসী নানাভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। ওদিকে কারাসংস্কার-বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োজিত করা হইল।

তারপর, ইংলণ্ডের বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুর দণ্ডবিধি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তৎকালে ইংলণ্ডে অতি কঠোর আইন প্রচলিত ছিল। সামান্য অপরাধের জন্য লোকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইত। নরহত্যার অপরাধে যেরূপ শাস্তি প্রদত্ত হইত, সামান্য জালের অপরাধেও তদ্রূপ দণ্ড দেওয়া হইত। একবার একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক তাহার শিশুর শীত নিবারণের জন্য একখণ্ড শীতবস্ত্র অপহরণ করে; এই অপরাধে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি সামান্য একটি বৃক্ষ-কর্ত্তনের অপরাধেও বিচারকগণ ফাঁসীর হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হুজুগের মাথায় তৃণস্তূপে অগ্নি-সংযোগ করিয়া অনেক উচ্ছৃঙ্খল যুবক প্রাণ হারাইয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ মৃতপ্রায় ছাগ-শিশুকে গৃহে লইয়া গিয়াও অনেক ক্ষুধাতুর ব্যক্তি চৌর্য্যাভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে দণ্ডিত হইয়াছে।

এই সকল কঠোর ও নিষ্ঠুর শাসনের হস্ত হইতে অবোধ অশিক্ষিত জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য পরদুঃখকাতরা এলিজাবেথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই সকল মূক জনমণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অসভ্যজনোচিত আইনের সংস্কারসাধনের জন্য শাসকবর্গকে তিনি পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় জীবিতকালে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে সমাজসেবার যে অপূর্ব্বভাব উদ্দীপিত করিলেন তাহা আর বিনষ্ট হইল না, বরং দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেশবাসীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল; জনসমূহ প্রসিদ্ধ-নেতৃবর্গের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। অবশেষে এলিজাবেথের সাধনা সিদ্ধ হইল; ইংলণ্ডে হত্যাপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধের জন্য যে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল তাহা রহিত হইল।

ইহাতেই এলিজাবেথের কর্ম্মের অবসান হয় নাই। তিনি ইংলণ্ড ও

স্কটল্যাণ্ডের হাসপাতাল ও পাগলাগারদসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সকল স্থানে তিনি যে সকল ক্রটী দেখিতে পাইলেন, নির্ভয়ে সে সকল কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে মতিচ্ছন্ন লোকদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হইত; হতভাগ্যদের অনেককে শৃঙ্খলিত করিয়া অন্ধকারময় গহ্বরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কোন কোন পাগলাগারদে পাগলদিগের প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করা হইত; তাহাদের খাদ্যদ্রব্য মৃত্তিকার উপর কাষ্ঠপাত্রে একত্র সন্নিবেশিত হইত। এই সকল বর্ব্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে এলিজাবেথ তীব্র প্রতিবাদ করেন।

কারাসংস্কার-ব্যাপারে তিনি য়ূরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং নৃপতিবৃন্দের ও রাজপুরুষগণের নিকট নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তিনি স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি কখনও উচিত কথা বলিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ফ্রান্সের রাজাকে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, "আপনি যখন কারাগার নির্ম্মাণ করেন, তখন এই কথা মনে রাখিয়া নির্ম্মাণ করিবেন যে, সেই কারাগৃহে যেন আপনার নিজের সন্তানেরাও অবস্থান করিতে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে।" সার রবার্ট পীলকেও তিনি বলিয়াছিলেন, 'উন্মুক্ত আকাশ-মার্গ কারাবাসিগণের নিকট রুদ্ধ করিও না—আলোকহীন কক্ষ নির্ম্মাণ করিও না; মনে রাখিও, তোমার সন্তানগণও এই কারাগারে আশ্রয় লইতে পারে।"

বস্তুতঃ কারাবাসীদিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা, তিনি অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং এই প্রথা নিবারণের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এলিজাবেথ সকলের হৃদয়

অধিকার করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই জনমণ্ডলী তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুণ্যলাভ করিতে লালায়িত হইত এবং রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের প্রভাবে তিনি ধরাবক্ষে যে সুশোভন ও অক্ষয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, স্বার্থলোলুপ ও পাশববলদৃপ্ত মানব সেই-রূপ রাজ্য-সৃষ্টির কল্পনা মনেও আনিতে পারে কি না সন্দেহ। হতভাগ্য নরকুলের দুঃখ ও দুর্দ্দশা-মোচনে এবং পতিতের উদ্ধার-সাধনে অর্দ্ধশতাব্দী-কাল অক্লান্তভাবে ও একাগ্রচিত্তে পরিশ্রম করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি জগদ্বাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের বক্ষে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে।

## মুসলমানসমাজে শিক্ষাবিস্তারে

# স্যার সৈয়দ আহম্মদ।

"চাহেনা নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হলে নহে কম্পমান ;
জীবন সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাঁহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয় নিশান"।

—মানকুমারী।

আলীগড় কলেজ স্যার সৈয়দ আহম্মদের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তঃপাতী আলীগড় নামক স্থানে উক্ত কলেজ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় কলেজসমূহের মধ্যে ইহা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রতিবৎসর শত শত জ্ঞানপিপাসু মুসলমান যুবক অধ্যয়নার্থ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এখানে সমবেত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে প্রায় একহাজার ছাত্রের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত আরবীভাষা ও ইস্‌লামধর্ম্মসংক্রান্ত শিক্ষার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান যাহাতে প্রাচ্যজাতীয় ধর্ম্মমতসংস্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া মুসলমান যুবকগণের চরিত্রগঠনের সহায়তা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ সূচিত হইয়াছে। এই সূচনার মূলে স্যার সৈয়দ আহম্মদ ; তিনিই এই অনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা।



স্যার সৈয়দ আহম্মদ

স্যার সৈয়দ আহম্মদের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই প্রাচ্যভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তিনি প্রাচ্যবিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতীচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার তাঁহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল। নিজে ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি ইংরাজি শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের জন্য রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারকার্য্যে স্যার সৈয়দ আহম্মদও তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উদারভাবাপন্ন অথচ ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান তৎকালে ভারতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান সমাজের মঙ্গলচিন্তা তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল; স্বজাতির উন্নতিবিধান তাঁহার সাধনার প্রধান বিষয় হইয়াছিল।

যে সময়ে স্যার সৈয়দ আহম্মদ শিক্ষাপ্রচারব্রত গ্রহণ করেন, সে সময়ে মুসলমানসমাজে শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। সিপাহীবিদ্রোহের কুফল দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আরবী ও পার্শী সাহিত্যের চর্চ্চা ধীরমন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ভূগোল, আধুনিক বিজ্ঞান বা ইতিহাস-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মুসলমানগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবলমাত্র তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রই তখন মুসলমান সমাজের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তখন রক্ষণশীল মুসলমানসমাজ ইংরাজিশিক্ষার ঘোর বিরুদ্ধবাদী, কারণ তাহাদের এই বিশ্বাস যে, ইংরাজি-শিক্ষা ইস্‌লামধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং ইহার প্রভাবে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মভাব দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইবে।

কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সমাজহিতৈষী সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে দেখিতে পাইলেন যে, ইংরাজিশিক্ষা ব্যতিরেকে মুসলমানজাতি

প্রতীচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি আহরণে সমর্থ হইবে না; ইংরাজিশিক্ষা মুসলমানসমাজে প্রবর্ত্তিত না হইলে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের জাতীয় উন্নতির কোন আশা নাই। তাই তিনি ইংরাজি ভাষার মধ্যদিয়া পাশ্চাত্য শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। "শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা"—ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র হইল।

অনুদার-প্রকৃতি ও সঙ্কীর্ণমনা বহুলোক তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। রক্ষণশীল মৌলবীসম্প্রদায় সৈয়দ আহম্মদকে তাহাদের ইস্‌লাম ধর্ম্মের ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অতি জঘন্য ভাবে এই মহাপ্রাণ উদারচেতা পুরুষের নানাপ্রকার ঈর্ষা-মূলক কুৎসা রটাইতে লাগিল। স্বাধীনচেতা সৈয়দ আহম্মদ সরল বিশ্বাস ও অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত তাঁহার লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। শত্রু-পক্ষের ভীষণ আক্রমণ ও ভয়প্রদর্শন তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি দৃঢ়তাসহকারে, নির্ভীক হৃদয়ে, দ্বিগুণ উৎসাহে স্বকীয় শিক্ষামত প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন জানিয়াও মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রতিপক্ষের বাধাবিঘ্ন যেন তাঁহার হৃদয়ে অযুত হস্তীর বল প্রদান করিতে লাগিল।

অবশেষে এই মহাপুরুষেরই জয় হইল। ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম্মা-বলম্বিগণ ইংরাজিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিল। তাহাদের অমূলক আশঙ্কা দূর হইল, এবং দেশের গণ্যমান্য বহুলোক তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম, রামপুরের নবাব, নিজামমন্ত্রী স্যার সলারজঙ্গ ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী লোকের অর্থানুকূল্যে তাঁহার চিরপোষিত আলীগড় কলেজ স্থাপিত হইল। তাঁহার

মহদনুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশার্থ, হিন্দুরাজগণও সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের উদারতার পরিচয় প্রদান করিলেন। সৈয়দ আহম্মদের কলেজে মুসলমান ছাত্রবৃন্দ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, আইনতত্ত্ব ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করিয়া, ভারতে মুসলমান জাতির নব অভ্যুদয়ের যুগ সূচনা করিল। সমাজহিতৈষণা, সরল বিশ্বাস ও সৎসাহসের বিজয়বার্ত্তা ভারতে প্রচারিত হইল।

সৈয়দ আহম্মদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় আকবরের একজন মন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ পাঠদ্দশায়ই পিতৃহীন হন। তাঁহার বিদুষী মাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। মাতার সযত্ন শিক্ষাগুণে যৌবনেই তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়। যদিও পারিবারিক অস্বচ্ছলতা-বশতঃ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি লেখাপড়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তথাপি অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে চিরজীবন বলবতী ছিল। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে সৈয়দ আহম্মদ একজন শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত।

তখন দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ধ্বংসাবশিষ্ট মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে তখনও ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গৌরবচ্যুত, লুপ্তশক্তি মোগলসম্রাট্গণ দেশে শান্তিরক্ষায় সম্পূর্ণ অসমর্থ; যুদ্ধবিগ্রহ এবং অত্যাচার-অবিচারের তাণ্ডবনৃত্যে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত। ইংরাজবণিক্গণ এই সন্ধিক্ষণে তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ নিয়াই ব্যস্ত ছিল, সুতরাং দেশের হিতকর অনুষ্ঠানে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ে, তাহারা মনোযোগ প্রদর্শন করিবার সুযোগ পায় নাই। এইরূপ অবস্থায় দেশের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছিল। শিক্ষার অভাবে জনসাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃত শিক্ষালয় বলিয়া কোনও অনুষ্ঠান তখন বিদ্যমান ছিল কিনা সন্দেহ।

সুতরাং স্বীয় গৃহেই জননীর তত্ত্বাবধানে সৈয়দ আহম্মদ সমস্ত শিক্ষা লাভ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উপর প্রকাণ্ড সংসারের ভার পড়িল। বাধ্য হইয়া তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। অবশেষে প্রতিযোগিতাপরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্‌সেফ্ পদে নিযুক্ত হন। সুবিচারকরূপে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং শেষে দিল্লীর সদর আমিনের পদে উন্নীত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি জ্ঞানানুশীল হইতে বিরত হন নাই। এই সময় তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তারপর ভারতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অনলশিখা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই দুঃসময়েও ইংরাজ-শাসনের প্রতি মহামনা সৈয়দ আহম্মদের শ্রদ্ধাভক্তির বিন্দুমাত্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহার চেষ্টায় বহু ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর প্রাণরক্ষা হয়। যখন বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল, তখন আবার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সিপাহীবিদ্রোহে লিপ্ত ছিল এই সন্দেহে, অথবা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অমূলক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া, ইংরাজগণ বহু ব্যক্তির প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন। তখন ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ সৈয়দ আহম্মদ তাহাদের পক্ষসমর্থনার্থ নির্ভীকহৃদয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। নিরপরাধ ব্যক্তি যাহাতে কঠোর শাসনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় আইনের কঠোরতা অনেকটা হ্রাস হইল এবং অনেক হতভাগ্য সে যাত্রায় রক্ষা পাইল। এ সময়ে নিঃস্বার্থভাবে নিঃসহায় দেশবাসীর উপকার সাধন করিয়া একদিকে যেমন তিনি অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান

করেন, অপরদিকে নানাবিষয়ে রাজকর্ম্মচারীর সহায়তা করিয়া তেমন তিনি রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। একবার তাঁহার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা আয়ের এক বিশাল সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হইল। নির্লোভহৃদয় সৈয়দ আহম্মদ অম্লানবদনে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই সম্পত্তি পূর্ব্বে এক বিদ্রোহী সরদারের অধিকারভুক্ত ছিল। যে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া একটি পরিবার দীনদশায় উপনীত হইয়াছে, সেই সম্পত্তির উপভোগবাসনা সৈয়দ আহম্মদের হৃদয়ে স্থান পাইল না।

সিপাহীবিদ্রোহের ফলে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে একটা অবিশ্বাসের ভাব সঞ্জাত হয়। ক্রোধ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাবই প্রবল হইয়া উঠে। সৈয়দ আহম্মদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরস্পর সম্বন্ধে পরস্পরের অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে এই অসন্তোষ ও বিদ্বেষভাব অচিরে যাহাতে দূরীভূত হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্ত্তব্যপরায়ণ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসীর চেষ্টা করা উচিত। তাই সিপাহীবিদ্রোহের মূল কারণ আলোচনার প্রসঙ্গে অতি দক্ষতাসহকারে ভারতবাসী জনসাধারণের অকৃত্রিম রাজভক্তি ও ইংরাজ শাসনপ্রীতির বিষয় বর্ণন করিয়া তিনি ইংরাজ জাতির ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। দেশবাসী জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীর অনধিকার—এই দুই কারণ দূরীভূত হইলেই যে ভারতবাসীর মনঃক্ষোভের কারণ দূর হইবে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের সূচনা হইবে, সৈয়দ আহম্মদ ইহা বিশেষভাবে রাজপুরুষগণের গোচরীভূত করেন। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়াই, বোধ হয়,

ভারতের প্রথম রাজপ্রতিনিধি, সদাশয় লর্ডক্যানিং ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া, ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা এবং রাজা প্রজার মিলনভূমির সূত্রপাত করেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যভাবের আদানপ্রদানের সুব্যবস্থা ব্যতিরেকে, ভারতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হইতে পারে না। তাই সৈয়দ আহম্মদ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর অধিগম্য করিবার জন্য, উক্ত বিষয়সম্বন্ধীয় প্রধান ইংরাজি গ্রন্থসমূহ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিতে মনন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্যোগে ইতিহাস, জীবনচরিত, অর্থনীতি, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের বহু ইংরাজি গ্রন্থ অনূদিত ও প্রচারিত হয়। আলীগড় সহরের যে গৃহে ইহার অধিবেশন হইত, এখন সেই গৃহ আলীগড় কলেজের ছাত্রাবাসে পরিণত হইয়াছে।

যদিও তিনি নিজে ইংরাজি ভাবে শিক্ষিত হন নাই, তথাপি ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহা-দিগকে অনুকরণ করিয়া ভারতবাসী অনেক শিখিতে পারে। তাই তিনি ইংলণ্ডের আচারব্যবহার, শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনপ্রণালী ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে যখন তাহার দ্বিতীয় পুত্র গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তিনিও ইংলণ্ড দর্শনার্থে তাহার সঙ্গে গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে তিনি ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরম যত্নসহকারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন এবং উহাকে ভারতের উপযোগী করিয়া এদেশে প্রবর্ত্তন করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকেন। যে সতর মাস ইংলণ্ডে ছিলেন, সে সতর মাস

তিনি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া তথাকার অধ্যাপনাপ্রণালী অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করেন। তথাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী, উন্নত অবস্থা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ভারতে ছাত্রাবাস-সম্বলিত এক মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই তিনি কলেজগৃহ ও ছাত্রাবাস প্রভৃতির নক্সা প্রস্তুত করেন, এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি প্রণালীতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা, স্বীয় উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখেন। মুসলমানদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে. পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইবে। কি উপায়ে তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের এই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহাদিগকে তদনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কি উপায়ে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া আলীগড়ে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার চিরপোষিত আশা পূর্ণ করিবেন, সেই চিন্তা দিবারাত্র তাঁহার হৃদয়রাজ্য আলোড়িত করিতে লাগিল।

অবশেষে এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিনি একটি শিক্ষাসমিতি গঠন করিয়া নিজেই তাহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করেন। যথাসময়ে তাঁহাদের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া রক্ষণশীল মুসলমান-সম্প্রদায় যে, সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করেন যে, সরকারী বা মিশনারী স্কুল ও কলেজে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা মুসলমান যুবকগণের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ হইতে পারে না; কারণ প্রাচ্য শিক্ষা

ও সভ্যতাকে পুনর্জ্জীবিত করা বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই ইস্‌লাম ধর্ম্মে আস্থাবান্, ইস্‌লাম জ্ঞানবিজ্ঞানের গৌরবে গৌরবান্বিত, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষভাববিহীন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে যাহাতে মুসলমান যুবকগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে তাহারা একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুসারে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে একটি 'অর্থসংগ্রহ কমিটি' গঠিত হয়। সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার স্বভাবোচিত উৎসাহ ও অধ্যবসায়সহকারে কলেজপ্রতিষ্ঠার্থ স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অর্থসংগ্রহে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার একাগ্র সাধনায় দুই বৎসরের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা আলীগড়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কলেজে পরিণত হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আলীগড়ে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার প্রিয় কলেজের উন্নতিবিধানে প্রবৃত্ত হন। এই বৃদ্ধবয়সেও দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিজব্যয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বীকে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষা নিঃস্বার্থ সমাজসেবার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এইরূপ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও একাগ্র সাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার দেশবাসী আলীগড়ে কলেজপ্রতিষ্ঠার্থ অকাতরে ও মুক্তহস্তে তাঁহার সাহায্যভাণ্ডারে অর্থদান করিতে লাগিল।

ভারতবাসী নিজের চেষ্টায়, নিজের অর্থে এবং নিজের পরিচালনায়,

কিরূপে এরূপ একটি মহদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, তাহা স্তার সৈয়দ আহম্মদ প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। পরমুখাপেক্ষী, আত্মশক্তিতে সন্দিহান, ভারতবাসীর হৃদয়ে এইরূপে আত্মাদরবোধ জাগ্রত করিয়া এবং স্বাবলম্বনের ভাব আনয়ন করিয়া, তিনি দেশের ও সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

# নৈতিক উন্নতিবিধানে

# কেশবচন্দ্র।

"কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু,—হৃদয়, হৃদয়!"

—অক্ষয় বড়াল।

আত্মোন্নতি, পরহিতরতি ও ভগবদ্ভক্তি এই তিনটি মানবচরিত্রের প্রধান লক্ষণ। ইহাদের সামঞ্জস্যবিধানেই মানবজীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা। সেবক কেশবের জীবনে ইহাদের অপূর্ব্ব সমাবেশ ও পূর্ণ-বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম জীবনে তিনি স্বকীয় চরিত্রগঠনের ব্যাপার লইয়া বিব্রত; মধ্য জীবনে তিনি বঙ্গীয় যুবকগণের নৈতিক উন্নতি-বিধানার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ; জীবনসায়াহ্নে তিনি সংসারবিরাগী ভগবদ্ভক্ত।

বিবেক ও বৈরাগ্য কেশবের আবাল্য সুহৃদ, এবং বিশ্বাস তাঁহার আজীবন সঙ্গী ছিল। তাঁহার বদনমণ্ডলে ভগবদ্বিশ্বাসের বিমল বিভা সর্ব্বদাই প্রতিভাত হইত। ভগবদ্বিধানে কেশবের অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি প্রার্থনাকে তাঁহার চিরসঙ্গী করিয়াছিলেন। সরল ব্যাকুল প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে ঈশ্বরের বাণী অন্তরমাঝে প্রকাশিত হয়—ইহা তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে এবং রাত্রিতে একটি লিখিত প্রার্থনা সাধন করিতেন। প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি হৃদয়ে দুর্জ্জয় বল লাভ করিলেন। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ ও প্রলোভন তাঁহার

সঙ্কল্পের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রার্থনা দুর্ব্বল চিত্তে বলসঞ্চার ও ভগ্নোৎসাহ হৃদয়ে উৎসাহ প্রদান করে। তাই কেশবচন্দ্র বলিতেন—"প্রার্থনা কর বাঁচিবে, চরিত্র ভাল হইবে, যাহা কিছু অভাব পাইবে।"

বিবেকের বাণী কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। পাপবোধ তাঁহার এত প্রবল ছিল যে, সামান্য কোনও অন্যায় কার্য্য করিলেই তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইত, এবং তখনই তিনি ভগবানের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিতেন। এমনকি পাপের সম্ভাবনা দেখিলে তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিতেন। এইরূপ প্রবল পাপবোধ ছিল বলিয়াই, তিনি পবিত্র জীবন যাপন করিয়া স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। "জাগ্রত নরক তাঁহার জাগ্রত স্বর্গের কারণ হইয়াছিল।"

আহারবিহার, পোষাকপরিচ্ছদ, এবং কথাবার্ত্তা সকল বিষয়েই কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব সংযম ছিল। জীবনের প্রথম ভাগেই বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। যে সময়ে হিন্দুকলেজের নীতিমান্ ছাত্রগণ পর্য্যন্ত মদ্যমাংস আহার করিতে দ্বিধা বোধ করিত না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য উপাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তখনও সংযমী যুবক কেশবচন্দ্র দেশাচারের বিরুদ্ধে কিরূপে স্বকীয় বিবেকানুমোদিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে কেশবচন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল। মহর্ষি হিন্দুকলেজের শিক্ষিত যুবকগণের রুচির বিষয় অবগত ছিলেন, এবং তৎকালোচিত রীতি অনুসারে কেশব ও অন্যান্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মাংসের আয়োজন করিয়াছিলেন। মাংসই তখনকার যুবকগণের প্রিয়

খাদ্য। মাংস ব্যতীত ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত ছিল। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ সমাগত হইলেন। কেশবচন্দ্রও তথায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভোজনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু একি! যখন অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ পরম পরিতোষসহকারে ভোজনে রত, তখন কেশবচন্দ্র ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নিঃশব্দে উপবিষ্ট। ইহা দেখিয়া মহর্ষি বিস্মিত ও অপ্রস্তুত হইলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, সে যুবক নিরামিষাশী, কখনও মাংস গ্রহণ করেন না। তখন তাড়াতাড়ি করিয়া কেশবের জন্য কিঞ্চিৎ ভাজি ও রুটির আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল। তিনি তাহা পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন। সংযতাহারী কেশবের প্রতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি ও আদর আরও বর্দ্ধিত হইল। মহাপুরুষই মহাপুরুষের চরিত্রের মর্য্যাদা ও মহত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। তখন হইতেই তিনি যৌবনের সুখভোগ বিষবৎ ত্যাগ করিয়া সরল সাধুজীবন কাটাইতে আরম্ভ করেন। তরল আমোদপ্রমোদকে তিনি নরকের পথজ্ঞানে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। রিপুর উত্তেজনায় যে সময়ে যুবকগণ বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়, সেই যৌবনেই স্বকীয় সাধনা ও সঙ্কল্পবলে কুপ্রবৃত্তিগুলিকে তিনি বশে আনিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন। সুখসম্পদের ক্রোড়ে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যে সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের অন্যান্য যুবকগণ যখন বেশভূষার আড়ম্বর লইয়া ব্যস্ত থাকিত, তখন তিনি সামান্য আচ্ছাদনে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পরিতুষ্ট হইতেন। যাহাতে গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পায়, কুচিন্তার দিকে

মন না যায়, এমন সকল পুস্তক তিনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে।" অপূর্ব্ব সংযম ও প্রাণপাত সাধনাদ্বারা কেশব অন্তরস্থিত কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্যের উপাসক, কেশবচন্দ্র এখন বঙ্গের যুবকসম্প্রদায়ের নৈতিক উন্নতিবিধানে রত হইলেন। অচিরকালমধ্যে তিনি তাহাদের প্রাণে এক নবশক্তি ও নবভক্তির উদ্রেক করিলেন। ১৮৫৯ সনের ২৪শে এপ্রিল কলুটোলায় ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এখানে কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধন এবং ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে সুচারুরূপে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণকে নীতি ও বিবেকানুমোদিত পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং অপরিসীম উৎসাহ ও উদ্যমসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজ মৃতবৎ ছিল, এবং প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া শুধু কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত। কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর, উহা উদ্যম, উৎসাহ ও সৎকার্য্যের আলয় হইয়া উঠিল।

তিনি তৎকালীন যুবকগণের চরিত্রগঠনের জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের নৈতিক অভাব দূরীকরণার্থ একটি ভ্রাতৃসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় নীতিবিষয়ক আলোচনা হইত। আলোচিত বিষয়গুলি দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে সকল যুবকই প্রাণপণ চেষ্টা করিত এবং তাহাদের চেষ্টার ফল পরদিনের সভায় অকপট হৃদয়ে বিবৃত করিত। সেই সভায় যুবকগণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনার ভাব

পরিলক্ষিত হইত। কেশবচন্দ্রের অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব যুবকগণকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কেশবের ভগবদ্বিশ্বাস, কেশবের নীতিপরায়ণতা, কেশবের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, এবং সর্ব্বোপরি কেশবের উৎসাহ ও উদ্যম দিন দিন যুবকগণের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিল। তাহাদের জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং তাহারা স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সত্যবাদিতা ও পরহিতরতি সেই সকল যুবকগণের চিরসঙ্গী হইয়া উঠিল। এই সকল যুবক লইয়া কেশবচন্দ্র উৎসাহভরে দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজে সেবার ভাব জাগিয়া উঠিল। আজকাল ব্রাহ্মসমাজ দেশে শিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে, দুঃস্থ লোকের সাহায্যকল্পে, এবং রোগীর শুশ্রূষার জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার বীজ কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজে রোপণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাপ্রচার ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যকে তিনি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে ইহাদিগকে তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে, তদুদ্দেশ্যে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ জনহিতকর কার্য্যে আগ্রহের সহিত যোগদান করে নাই। তাই কেশবচন্দ্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ যদি আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে যেখানে যে প্রকারে হউক, দেশের যাহাতে মঙ্গল হয়, আমরা তাহাতে আপতিত হইব, এবং যাহারা মঙ্গলানুষ্ঠানসাধনে তৎপর, তাহাদের সঙ্গে যোগ দিব।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ সভায় প্রস্তাব করিলেন যে, যাহাতে দেশমধ্যে সাধারণের হিতকারিণী বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করা উচিত।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেকের এরূপ ধারণা ছিল যে, শিক্ষা-কার্য্যের উন্নতি ও প্রসার রাজপুরুষগণের কার্য্য। এই ভ্রান্ত ধারণার

বশবর্ত্তী হইয়া দেশবাসী জনসাধারণ অনেক সময় রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিত। তাই অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে ও চেষ্টায় জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আমাদের দেশে তখনও বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে দেশবাসীর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-বোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন—

"রাজপুরুষেরা যতদূর করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু রাজপুরুষেরা যে সকলই করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাঁহাদের হস্তে আরও নানাকার্য্য রহিয়াছে। তাঁহারা আমাদের জন্য অন্নপর্য্যন্ত পাক্ করিয়া দিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আমাদের আপনাদের যত্ন চাই, অর্থ চাই। বিদ্যা, বল, ধন, যিনি যাহা দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, তবে সকলের দান একত্র হইলে কিনা হইতে পারে? আমাদের যদি যথার্থ চেষ্টা থাকে তবে আমরা কিনা করিতে পারি?

আমরা সকলেই ঈশ্বরের কর্ম্মচারী, ভৃত্য; সত্যের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা আমাদের কার্য্য। আমরা আপনাদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের শিখা রহিয়াছে, আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরের ভাব নিহিত আছে।"

শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার কতদূর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তৎকালপ্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেই উহা সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার মন্তব্য বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেন—

"এখনকার বিদ্যাশিক্ষা-প্রণালী অত্যন্ত দোষাক্ত, শিক্ষা দিবার

যে যথার্থ তাৎপর্য্য তাহা সিদ্ধ হয় না; বুদ্ধিবৃত্তিসকল পরিচালিত হইয়া যাহাতে উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় না; কেবল কতকগুলি সত্য উদরস্থ করাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। যুবকেরা যৎকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তখন বিদ্যার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ দেখা যায় বটে, কিন্তু যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের ভাব আর একপ্রকার হইয়া যায়। কেরাণীরাজ্যে একবার প্রবেশ করিলে তাহাদের সকল উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া যায়।"

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা কেবশচন্দ্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"বিদ্যার দ্বার কেবল ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট মুক্ত নহে। সাধারণ লোকের মন যখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তখন কতিপয় লোকের বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল যাহা আমাদের হৃদয়কে অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের মন প্রস্তুত না হইলে, দেশের কুরীতির উচ্ছেদসাধন কখনই হইতে পারে না।"

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, বোধ হয়, কাহাকেও যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অধুনাপ্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা ভারতীয় স্ত্রীজাতির উপযোগী কিনা সে সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধন অনেকের নিকট যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু কেশবচন্দ্র এ সমন্ধে যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল আদৃত হইবে এবং সে আদর্শ ভারতের বিভিন্ন সমাজকে স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত করিবে।

"এদেশে স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার

কারাগারসমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত থাকে। দেশের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাসস্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় না হইলে দেশের মঙ্গল কখনই নাই।"

বর্ত্তমান সময়ে পল্লীস্বাস্থ্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত গ্রামবাসিগণের দুর্দ্দশামোচনের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা চলিতেছে, এবং রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্তও স্থানে স্থানে হইতেছে। কর্ম্মীর দল বা সেবকসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। সমাজসেবার এই ভাব বহু পূর্ব্ব হইতেই পরদুঃখকাতর কেশবচন্দ্রের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাই ১৭৮৩ শকে যখন বঙ্গদেশ জ্বরের প্রবল প্রকোপে উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সে সময় কেশবচন্দ্র সভাস্থলে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়া বন্ধুগণকে তন্মোচনার্থ প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"এ ভীষণ সময়ে উদাসীন থাকিলে আর চলিবে না। এখন কি উদাসীন থাকিবার সময়? যখন ভাগীরথীতীরস্থ অসংখ্য জনগণ এই বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে, ভ্রাতাভগিনীরা চিকিৎসাভাবে, ঔষধাভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পথেঘাটে জনশূন্য অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তোমাদের হৃদয় কি উত্তর দেয়? আমরা যখন কথা কহিতেছি, এই সময়েই হয়ত কোন মাতা স্বীয় শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, হয়ত কোন নিরীহ শিশু শয্যাশায়ী পীড়িত মাতার নীরস স্তন মুখে দিয়া বারংবার আকর্ষণ করিতেছে। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে জাহ্নবীর উভয় কূলে নয়নে কি

নিরীক্ষণ করিবে, না, রাশি রাশি পরিত্যক্ত শবশয্যা উপর্য্যুপরি বিস্তৃত রহিয়াছে, ধূমে অন্তরীক্ষ মেঘের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়াছে; শোকানলের সহিত কালানলও মুহুর্ম্মুহুঃ প্রজ্বলিত হইয়া অগণ্য শবদেহ ভস্মসাৎ করিতেছে; এবং ভীষণ আর্ত্তনাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত হইতেছে; বিষাদাকুলা মাতা মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া উচ্চরবে রোদন করিতেছে।"

এইরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি জনমণ্ডলীকে পরদুঃখমোচনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের সাহায্যকল্পে সকলকে অকাতরে অর্থদান করিতে অনুরোধ করিলেন। রোগক্লিষ্ট নিঃসহায় জনগণের দুঃখদুর্গতি নিবারণের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, ঔষধ ও পথ্যাদিসহ, পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করিলেন। সেবাধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তিনি যুবকগণকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলেন। যুবকগণ নিঃস্বার্থভাবে রোগগ্রস্ত লোকের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। আর তিনি নিজে জ্বলন্ত উৎসাহসহকারে বিবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

কেশব কলিকাতার সমৃদ্ধিসম্পন্ন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সরল ও সহজ-ভাবে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের যুবকগণের মধ্যে সুনীতিসম্প্রসারণকল্পে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহারই দৃষ্টান্ত বঙ্গের শত শত যুবকের জীবনধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বঙ্গে তিনিই এক নবভাবের ও নবশক্তির সঞ্চার করেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত শত শত যুবক সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

## শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়

# ওবারলিন।

"জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই,
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি—তখনি জুড়াই!
নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি ওঠে পূর্ণ করে বুক!"

—হেমচন্দ্র।

পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বর্ত্তমান শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা শিশুর শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। ঋষিতুল্য ফ্রোবেলের "কুমার-কানন" শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর শিক্ষারাজ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। সম্প্রতি ইটালীয় বিদুষী রমণী ডাক্তার মণ্টেসরী তাঁহার "কুমারালয়ে" শিশুশিক্ষার এক নব-পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়া "কুমার-কানন" শিক্ষা-পদ্ধতিকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদেরও পূর্ব্বে যে মহাত্মা সর্ব্বপ্রথম য়ূরোপে শিশুবিদ্যালয় স্থাপন করেন, এখানে সংক্ষেপে তাঁহার কথাই বলিব।

আদি শিশু-বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও শিশুশিক্ষার পথ-প্রদর্শক ওবারলিন মধ্য য়ুরোপের ষ্ট্রাস্‌বর্গ নামক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক

যত্ন ও চেষ্টায় এবং তাঁহাদের সদুপদেশ ও সুশিক্ষার প্রভাবে বাল্যকালেই ওবারলিনের হৃদয়ে কোমল বৃত্তিসমূহ বিকশিত হইয়া উঠে। বিপন্নের দুঃখবিমোচন, নিঃস্ব জনের সহায়তাসম্পাদন এবং সমপাঠীদিগের প্রতি সহানুভূতিপ্রদর্শন করিতে পারিলে, একদিকে যেমন তাঁহার পরদুঃখ-কাতর কুসুমকোমল হৃদয় নাচিয়া উঠিত, অপরদিকে কোনরূপ পাপাচরণ সন্দর্শন করিলে তাঁহার পাপদ্বেষী বজ্রকঠিন হৃদয় পাপবিনাশনে, অত্যাচার নিবারণে, নিগ্রহদমনে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিত। তাঁহার মাতা পুত্রের চরিত্র-গঠনের জন্য বাল্যকালে সযত্নে যে বীজ রোপণ করেন, ভবিষ্যৎকালে তাহাই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক মহীরুহে পরিণত হইয়া অসংখ্য নিঃসহায় নরনারীর আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষা-সমাপন করিয়া ওবারলিন পিতার ইচ্ছাক্রমে ধর্ম্মযাজকের পবিত্র জীবন গ্রহণ করিলেন। তিনি যে স্থানে পেষ্টর বা ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সে-স্থানটি জ্ঞানালোক-বঞ্চিত কতিপয় গৃহস্থের আবাসভূমি ছিল। একটি পার্ব্বত্য প্রদেশে এই গ্রামটি অবস্থিত। এইস্থানের অধিবাসি-বৃন্দ সাধারণতঃ কৃষিজীবী। সুখস্বাচ্ছন্দ্যপরিপূর্ণ নগরের বিলাস-দ্রব্য তাহাদের নয়নপথে কখনও পতিত হয় নাই। তাহারা জীবনধারণোপযোগী সামান্য আহারে পরিতুষ্ট, নিরীহ ও ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু শিক্ষাভাবে তাহাদের হৃদয় অপ্রশস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। স্থানটি ষ্ট্রাসবার্গ-নগর হইতে একদিনের পথ। যাতায়াতের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, নগরের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রবও ছিল না। কাজেই শিক্ষার অবস্থা এখানে অতীব শোচনীয় ছিল। এই গ্রামে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা ছিল। পাঠশালার সেই অপ্রশস্তগৃহে শিশুগণ আবদ্ধ হইয়া থাকিত। তাহাদের পাঠোপযোগী পুস্তক অথবা উপযুক্ত অধ্যক্ষ ছিল না।

ওবারলিনের পূর্ব্বে ষ্টাউবার এই স্থানের পেষ্টর ছিলেন। তিনি একদিন

সেই পাঠশালায় যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাদের গুরুমহাশয় কোথায়?" ছাত্র গৃহকোণে শায়িত এক বৃদ্ধ লোককে দেখাইয়া দিল। ষ্টাউবার তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি ছাত্রদিগকে কি পড়ান?" সে বলিল, "কিছুই না।" "কিছুই না। এ কিরূপ কথা!" "আমি নিজে কিছুই জানি না; আমি আবার কি পড়াইব?" তখন ষ্টাউবার বলিলেন, "তবে আপনাকে গুরুপদে নিয়োগ করা হইল কেন?"

সেই বৃদ্ধ উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি অনেক বৎসর এস্থানের শূকর-রক্ষক ছিলাম। যখন জরাবার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত সেকার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযুক্ত হইলাম, তখন আমাকে এই শিশুদের ভারগ্রহণ করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

শিক্ষার এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া, ষ্টাউবার তন্মোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবসায় সাধারণের চক্ষে এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্কুল-মাষ্টার নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তিনি এক নূতন আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধি তাঁহারা রীজেণ্ট নামে অভিহিত হইতে লাগিল। তখন দলে দলে লোক আসিয়া সেই রীজেণ্ট বা শাস্তার পদের প্রার্থী হইল। তিনি গ্রামস্থ লোকদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য বর্ণমালা এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিলেন। সেই রক্ষণশীল জনসমাজ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই নব-প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে তাহাদের সেই মোহ অপগত হইলে লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা বাইবেল পড়িতে সমর্থ হইল। এইরূপে ষ্টাউবার তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার কথঞ্চিৎ পরিমাণে দুর করিতে সমর্থ হইলেন।

ওবারলিন আসিয়া ষ্টাউবারের আরব্ধকার্য্যের পরিসমাপ্তি ও পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, অক্ষম বৃদ্ধের হস্তে শিক্ষার ভার থাকিলে কোনরূপ সুফল পাওয়া যাইবে না। তাই এক যুবকদল গঠিত হইল। শিক্ষাদানপ্রণালী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাকার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। এই উৎসাহী যুবকদল শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া শিক্ষার প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল। যে সকল অজ্ঞান মূঢ় লোক প্রথমে এই নূতন সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন নানাপ্রকারে এই অশেষ-কল্যাণকর বিধানের সহায়তা-সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

বালকদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইলে সূক্ষ্মদর্শী ওবারলিনের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বাল্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, শিশুগণের শৈশবোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার প্রতি মাতাপিতার কোনরূপ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ দিবাভাগে তাঁহাদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কাজেই এই সকল শিশুগণের ভার কোনও বৃদ্ধ অক্ষম স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হইত। সেই বৃদ্ধাগণ নিজ নিজ অজ্ঞানতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত শিশুদিগকে উপযুক্তরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিত না।

ওবারলিনের ধ্রুববিশ্বাস ছিল যে, মাতৃক্রোড় হইতে শিশুগণের শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবকালে শিশুগণ অনুকরণ-বৃত্তির প্রভাবে ও ক্রীড়া কৌতুকের মধ্য দিয়া ভাল মন্দ, ক্রোধ ক্ষমা, পরিচ্ছন্নতা ও অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। সুতরাং এই শৈশব অবস্থায় তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ে মাতাপিতা অমনোযোগী হইলে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। এই দোষ অবধারণমাত্র কর্ম্মপ্রিয়, সমাজসেবী, ওবারলিন শিশু-

বিদ্যালয়-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণীর যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী কোমল প্রকৃতির কতিপয় প্রাপ্ত-বয়স্কা মহিলা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ওবারলিন কতিপয় শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিশুদিগের শিক্ষার ভার এই শিক্ষয়িত্রীদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। শিক্ষয়িত্রীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। কাজেই প্রথমতঃ সপ্তাহে মাত্র একদিন করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে লাগিল। অন্য ছয় দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উক্ত মহিলাগণকে অন্যান্য কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু ওবারলিনের অক্লান্ত চেষ্টায় ও উদ্যোগে শীঘ্রই অর্থাভাব বিদূরিত হইল এবং শিক্ষাকার্য্যপরিচালনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল।

শিক্ষয়িত্রীগণ পূর্ব্বেই শৈশবশিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে নানা-প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা শিশুবিদ্যালয়ে তাঁহা-দের শিক্ষাপ্রসূত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রীড়াকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-কর্ম্মের মধ্যদিয়া অলক্ষিতভাবে শিশুদিগের মানসিক উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়া-শীলতা ও চঞ্চলতা শিশুদিগের সহজ ধর্ম্ম। তাহারা একটা কাজ ভিন্ন ক্ষণকালও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং যখন তাহারা কোনরূপ ভাল কাজ দেখিতে পায় না, তখনই তাহারা নানাপ্রকার অকাজ করিয়া গৃহ বা বিদ্যালয়ের উৎপাত বর্দ্ধন করে। এইরূপ অকার্য্য-স্পৃহা দমন করিয়া, মঙ্গলজনক কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত, এবং সেই কাজের ভিতরে যাহাতে স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় শিশুগণ একটু বিমল আনন্দ

অনুভব করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাই সূক্ষ্মদর্শী ওবারলিন অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শিশুদিগকে তূলা-ধুনন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; আর কোমলবয়স্ক বালিকাগণ সূতাকাটা, সেলাই ও বুননকার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। যাহারা একেবারে ছোট ও এ সকল কার্য্যে অক্ষম ছিল, তাহারা বসিয়া বসিয়া বড় ভাইবোনদের কার্য্য দর্শন করিয়া আমোদ অনুভব করিত। শিশুগণ যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তখন শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদের নিকট বাইবেল বা অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের নানাপ্রকার গল্প বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। কখনও কখনও বা তাঁহারা প্রাণিজগৎ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোহর গল্প করিয়া শিশুদের তৃপ্তিসাধন করিতেন।

যে শিক্ষা পাশব প্রবৃত্তিসমূহ সংযত ও বশীভূত করিয়া শিশুচরিত্রে সত্যপ্রিয়তা, দয়াশীলতা এবং শান্তিপ্রিয়তা বিকশিত করিয়া তোলে, যে শিক্ষা পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণা ও অপার মহিমার উজ্জ্বল চিত্র শিশুদিগের সমক্ষে উপস্থিত করে, যে শিক্ষা দৃষ্টজগতের সৌন্দর্য্যসজ্জা ও বিশ্বের মহামিলনমহিমা প্রকাশিত করে, সেইরূপ শিক্ষা যাহাতে অলক্ষিতভাবে শিশুচরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ওবারলিনের শিশুবিদ্যালয়ে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করা হইত।

শিক্ষয়িত্রী শিশুদিগকে ধর্ম্মসঙ্গীত, স্তোত্র-পাঠ, ভূগোল ও উদ্ভিদ্‌-তত্ত্বের স্থূল স্থূল বিবরণ শিক্ষা দিতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনয়নম্রতা এবং ভক্তিপরায়ণতার অভ্যাস গঠন করিয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ যত্ন লওয়া হইত। কুসুমরাজির সৌন্দর্য্য যাহাতে শিশুমন আকৃষ্ট করিয়া শিশু-প্রকৃতিকে কোমল ও মধুময় করিয়া তোলে, এবং যাহাতে কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সৌন্দর্য্যবোধ দিন দিন

বৰ্দ্ধিত হয়, শিক্ষাপ্রদানকালে শিশুবিদ্যালয়ে সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

ছয়বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক গুণের বিকাশোপযোগী এইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তাঁহাদের শিক্ষাদানপ্রণালী এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, শিশুগণ কখনও কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিত না। সপ্তবর্ষ বয়সে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য পাঠশালায় প্রবেশ করিত। এই বাল্যজীবনে তাহারা শিশুবিদ্যালয়ের সুশিক্ষার মধুময় ফল উপভোগ করিত। অনায়াসে তাহারা তখন তাহাদের বাল্যকালোপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইত। পূর্ব্বসঞ্চিত শিক্ষানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া উঠিত। ধর্ম্মভাব ও নৈতিক জীবনের যে বীজ শিশুবিদ্যালয়ে উপ্ত হইত, তাহা এখানে অঙ্কুরিত হইয়া সুশোভন ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস প্রদান করিত।

ওবারলিন নিজে এই সকল শিশুবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি বিদ্যালয়ের অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন অন্যান্য সকল ছাত্রকে ডাকিয়া আনিয়া নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র করিয়া তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন এবং তারপর ধর্ম্মবিষয়ক নূতন উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার স্বর এত কোমল, চিত্তাকর্ষক ও স্নেহপূর্ণ ছিল যে, তাঁহার উপদেশ-বাক্যগুলি সকলে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শ্রবণ করিত। শিশুগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে, তাহারা ওবারলিনের উপদেশ-বাক্য শুনিবার জন্য ছয়দিন পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত এবং সপ্তম দিনে তাঁহার সহাস্যবদন-নিঃসৃত কথামৃত সাদরে ও পরমপরিতোষ-সহকারে পান করিত।

ওবারলিন শিশুদিগের ব্যবহারের জন্য তাহাদের পাঠোপযোগী মনোহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার প্রতিবিদ্যালয়ে স্থাপন করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে একটি সম্পূর্ণ নূতন মৌলিক চিন্তা উপস্থিত হইল। তাঁহার জীবিতকালে সকল স্থানে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড পরে তাঁহার উদ্ভাবিত অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া শিক্ষা-প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। তিনি ভ্রমণশীল পাঠাগার য়ুরোপে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক একটি পুস্তকাধারে তিন মাস পর্য্যন্ত এক গ্রামে থাকিত। সেই গ্রামের সমস্ত লোক সেই তিন মাস উক্ত পুস্তক-সমূহ পাঠ করিয়া বিমল আনন্দ ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিত। তিন মাস অন্তে সেই পুস্তকাধার অন্য এক গ্রামে স্থাপন করা হইত। এইরূপে সমস্ত গ্রামে তিন তিন মাস অন্তর এই পুস্তকাধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। আর গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির ও আনন্দলাভের এই অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া ওবারলিনকে ধন্য ধন্য করিত।

ইহা প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে জর্ম্মাণ-রাজ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সে সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে ও সমাজ-মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে য়ুরোপে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যে সত্যের প্রচারকল্পে উক্ত মহাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নশিক্ষা-সংস্কারক প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সত্যটি এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের অপূর্ণ ও অঙ্গহীন শিক্ষারই পরিচায়ক। য়ুরোপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া আমেরিকা ও

জাপান এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষারাজ্যে কত উন্নতি সাধন করিয়াছে! আর আমরা বর্ত্তমান-অন্ধ ভারতবাসী প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতার কাল্পনিক গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি',
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী
বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে!"

## সমাজ-সেবায়

# বিবেকানন্দ।

"সত্যের হইব অনুচর,
দুষ্কৃতি, অনৈক্য, অনাচার,
মিছা মান, মিছা অপমান,
দেখিবনা রাখিবনা আর।
পীড়িতের ঘুচাইব ভার,
প্রতিষ্ঠিব ন্যায় সিংহাসন,
পতিতের করিতে উদ্ধার
উৎসর্গ করিব তনু মন।"

—কামিনী রায়।

রামকৃষ্ণ-মিশন ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ ভারতের যুবকগণের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ শত শত যুবক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সমাজসেবায় দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—ইহাই তাহাদের বেদমন্ত্র হইয়াছে। নিঃস্বার্থভাবে পরসেবা করিতে পারিলেই তাহারা নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। দেশে মহামারী উপস্থিত হইল, আর রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদল নিজ নিজ জীবন বিপদাপন্ন করিয়া ব্যাধিগ্রস্তলোকের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। শুনিতে পাইল, কোন স্থানে কোন দূরদেশে লোকগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অমনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের সাহায্যার্থ ধাবিত হইল। খবর আসিল, উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা দেশ প্লাবিত করিয়া গৃহস্থের আবাসগৃহ ভূমিসাৎ



বিবেকানন্দ

করিয়া গোমহিষাদি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, আর অমনি কর্ম্মীর দল সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের দুর্দ্দশামোচনে অগ্রসর হইল। ব্রহ্মপুত্রের অষ্টমী-স্নানে, গঙ্গাসাগরতীর্থে, হরিদ্বারের কুম্ভমেলায়—যে যে স্থানে পুণ্য-প্রয়াসী লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইতেছে—সেই সেই স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশনের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রীর সুখসুবিধার সুবন্দোবস্তের জন্য আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। কত পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তাহারা আশ্রয়দান করিতেছে, কত নিরক্ষর লোকের অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থ তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

সমাজ-সেবার এই অপূর্ব্ব ভাবটি ধর্ম্মপ্রাণ বীরহৃদয় বিবেকানন্দ হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত সুশিক্ষিত যুবক বিবেকানন্দ বৈরাগ্য ও ত্যাগের যে মহান্ আদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আজ শত শত শিক্ষিত যুবককে অনুপ্রাণিত করিয়া পরসেবার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকিলে পরমহংসদেবের শিষ্যগণ দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না; তাহাদিগকে দেশের দুঃখদারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "রামকৃষ্ণ-মিশন" সর্ব্বপ্রথম গঠিত হইল। এই "রামকৃষ্ণ মিশন" যে কতভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উহাদের উন্নত ও উদার ধর্ম্মভাবের কথা এখানে উল্লেখ নাই করিলাম। কিন্তু তাঁহারা সেবাধর্ম্মের যে উচ্চ আদর্শ সর্ব্বসমক্ষে

উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই আগ্রহভরে গ্রহণ করিবে।

বিবেকানন্দ সেবাধর্ম্মকে কিরূপ উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই একটিমাত্র বাক্য হইতেই পরিস্ফুট হইবে—

"ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলামূলা—এই সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম ; পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত।"

দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিয়া তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠে প্রতিবৎসর দরিদ্রনারায়ণের সেবার যে বিরাট আয়োজন হইয়া থাকে, বিবেকানন্দই উহার সূত্রপাত করেন। সেই দিন বেলুড়মঠে যে মোহন দৃশ্য প্রকটিত হয়, তাহা দেবতারও উপভোগ্য। নানাস্থান হইতে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সেখানে সমবেত। সকলের বদনেই ধর্ম্মের ছায়া প্রতিভাত। সংসারের দুঃখকষ্ট, জ্বালাযন্ত্রণা এবং পাপতাপের কথা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইয়া তাহারা ভগবানের নামগানে উন্মত্ত। কীর্ত্তনান্তে জাতিভেদ বিস্মৃত হইয়া সকলে প্রাঙ্গণে একসঙ্গে আহারে উপবিষ্ট। আহার্য্য পদার্থে কোনরূপ মৎস্যমাংসের ব্যবস্থা নাই, আছে শুধু স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকশবজি। অহিংসা ও সমদর্শিতার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

রুগ্ন ও আর্ত্তের দুর্দ্দশামোচনে বিবেকানন্দ সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যসুখ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি তাহাদের সেবায় রত থাকিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তিনি দার্জ্জিলিং গমন করেন। সেইখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ তিনি সংবাদ পাইলেন যে কলিকাতায় মহামারী ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যহ শত শত

লোক কালের করালগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহা শুনিয়া মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের হৃদয়তন্ত্রীতে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। তিনি শৈল-শিখরে আর এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে পারিলেন না। নিজের শারীরিক্ অসুস্থতাসত্ত্বেও অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মীর দল রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইল। ভগিনী নিবেদিতা আসিয়া বিবেকানন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কলিকাতায় একটি প্রশস্ত মুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া তথায় তাহারা একটি ছোটখাট সেবাশ্রম নির্ম্মাণ করিল। সেবকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইল। একদল পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া প্লেগরোগ-গ্রস্ত নরনারীকে সেই আশ্রমে আনয়ন করিতে লাগিল। অপরদল আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাদের শুশ্রূষায় রত হইল। তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত সেবায় সেইবার বহুলোক মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপে দেবতাজ্ঞানে দরিদ্রের সেবা করিতে হয়, উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কর্ম্মবীর বিবেকানন্দ দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ করিলেন। সমগ্র মানবমণ্ডলী তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দেশবাসীর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কতলোক শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া হীন জীবন যাপন করিতেছে, কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কত লোক প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, হিতাহিতবিবেচনাশক্তির অভাবে কতলোক দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া সমাজমুখে কালিমা লেপন করিতেছে! ইহা দেখিয়া বিবেকানন্দের ন্যায় স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মী তাহাদের উদ্ধারসাধনে অগ্রসর না হইয়া কি থাকিতে পারেন? ভারতের দরিদ্র ও অজ্ঞ লোকের অপরিসীম দুঃখদুর্গতির কথা ভাবিয়া

বিবেকানন্দের ভাবপ্রবণ হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি আমেরিকা হইতে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিলেন—

"এই যে গরীবগুলো পশুর ন্যায় জীবন যাপন কর্‌ছে, তার কারণ মূর্খতা। সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতগুলি ম্যাপ, গ্লোব, কিছু রাসায়নিক দ্রব্য চাই। তারপর মস্ত একটা কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীবগুর্‌বো জুটিয়ে আনা চাই। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোক্ খুলে, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে দিন দুপুরে কত গরীব মূর্খ আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও, চোক্ খুলে দাও। পুঁতিপাত্‌ড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।"

আমাদের দেশে একদল লোক আছেন, যাঁহারা সাধারণের শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরোধী। তাঁহারা মনে করেন যে সাধারণ লোক শিক্ষিত হইলে সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এবং সমাজের উচ্চপদস্থ লোকের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে। তদুত্তরে বিবেকানন্দ বলিতেছেন—

"যাঁহারা বলেন যে অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের, ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায়, জ্ঞানার্জ্জনে এবং আপনার অবস্থা উন্নতি করিবার সমান সুবিধা দিলে, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি, ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?

"মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নারীনর অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক; তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে, সমাজ উচ্ছন্ন যাইবে!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত!!”

জনসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রদারকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার ঘোর সন্দেহ ছিল। ভারতের লোক এত দরিদ্র যে তাহারা তাহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণের সাহায্যে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জনের লোভ সংবরণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও তাহারা তথায় তাহাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিবে কিনা সন্দেহ। তাই দরিদ্রের গৃহে গৃহে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাহাতে একটি নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর দল গঠিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তিনি মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে লিখিলেন—

“ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূলে জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য-দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর আমাদের দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া।”

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যতটা আবশ্যক, স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারও ততটা প্রয়োজনীয়। স্ত্রীজাতি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জননী। তাহারা সুশিক্ষিতা না হইলে, শুধু পুরুষের কি সাধ্য যে দেশকে উন্নত করিতে পারে? আমেরিকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া বিবেকানন্দের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছিল। আমেরিকার রমণীগণ দেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে যতদূর সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করে, পুরুষগণ তাহার শতাংশের একাংশও করে কিনা সন্দেহ।

পুরুষগণ সাধারণতঃ অর্থের দাস, অর্থসঞ্চয়ই তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাই আমেরিকার নারীসম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলিতেছেন—

"ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান্ নারী আমেরিকান্ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষ অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতি চেষ্টা করে। আর এরা কেমন স্বাধীন, সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব তাহাদের হাতে লইতেছে; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েদের পথে চল্‌বার যো নাই।"

"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্ন নারীকুলের আধারস্বরূপ হইবে।"

বিবেকানন্দের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার উপযুক্তা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতরমণীগণের মধ্যে যে অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি জাতীয়ভাবে শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বোসপাড়ার একটি ছোট গলিতে এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতললনাগণের ত্যাগ ও প্রেমের যে মহান্ ভাব পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, উহা মানবজাতির কল্যাণার্থ বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, সন্ন্যাসব্রতধারিণী মনস্বিনী নিবেদিতা সেইরূপ শিক্ষা প্রদানের শুভ সঙ্কল্প লইয়াই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ চরিত্রবল, অলোকসামান্ত সত্যানুরাগ, অপূর্ব্বদৃষ্ট ত্যাগধর্ম্ম ও সর্ব্ববিজয়ী প্রেম নিবেদিতার হৃদয়ের উপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর ইংলণ্ডবাসিনী সেই বিদুষী রমণী, নিজ দেশ, নিজ সমাজ ও সুখসৌভাগ্য চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার গুরুর চিরপোষিত আশা পরিপূরণার্থ ভারতবর্ষকে তাঁহার নিজ দেশরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার এইরূপ আরও অনেক নরনারী দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমত ও তৎপ্রদর্শিত কর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, বিবেকানন্দের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিবেকানন্দ উনচল্লিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এত শাস্ত্ররত্নের উদ্ধারসাধন ও এত হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। দর্শনের শুষ্ক তত্ত্ব বা ভক্ত জীবনের কর্ম্মবিমুখ উদাসীনতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি একাধারে জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর ছিলেন। ধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্ম্মের মাহাত্ম্যও প্রচার করিয়াছেন। সত্যের অনুচর বিবেকানন্দ পীড়িতের ও পতিতের উদ্ধারসাধনমানসে যে বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া সকলকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা আজও বঙ্গময় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বঙ্গের গৃহে গৃহে যুবকের প্রাণে দরিদ্রনারায়ণের সেবার যে উদার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিবেকানন্দেরই দান।

## রুগ্নের সেবায়

# ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।

"পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্মবিসর্জ্জন, চির আত্মদান!
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা ব'য় দু'নয়নে,
হৃদি তলে সদা চলে প্রেমের তুফান!"

—মানকুমারী

উনবিংশ-শতাব্দী দ্বিতীয় পাদ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় পাদে পদার্পণ করিয়াছে; রুশিয়ার দক্ষিণে ক্রিমিয়া প্রদেশে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। একপক্ষে রুশিয়া, অপর পক্ষে তুরস্কের সুলতান, ফরাসী ও ইংরাজ। দুর্ব্বল তুরস্ককে ক্ষমতা-লোলুপ রাজ্য-পিপাসু জারের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরাজ আজ সুলতানের পার্শ্বে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। রুশিয়া আজ তুরস্ককে তাহার স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত করিয়া অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া, স্বাধীনতার লীলাভুমি ইংলণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ ন্যায়ের ও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মস্তকে বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছে।

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। রুশিয়া দেশে দুরন্ত শীত আরম্ভ হইয়াছে। তুষার-সমাচ্ছন্ন উত্তর প্রদেশ হইতে হিমবাত প্রবাহিত হইয়া যুদ্ধক্লিষ্ট, সৈনিকগণকে প্রপীড়িত করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে



ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

বন্যাপ্লাবিত শিবির-মধ্যে একফুট পরিমিত জল দাঁড়াইয়াছে। সৈন্য-গণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। এমন সময়ে আবার ক্রিমিয়ার দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় উপস্থিত হইল। দেখিতে না দেখিতে সাগর-বক্ষ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল; উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে ভীম-বেগে আঘাত করিতে লাগিল। অর্ণবপোতসমূহ আত্মরক্ষায় বৃথা প্রয়াস পাইয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইল। তীরভূমিতে সন্নিবেশিত শিবিরসমূহ প্রমত্ত প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিসাৎ হইল। ইংলণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সৈনিক-গণের আহার-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্র, ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়া আনন্দভরে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিতেছিল, দৈব বিড়ম্বনায় তাহারা এই কালান্তক ঝড়ে বিনষ্ট হইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষগণের অবর্ণনীয়, অননুমেয় ও অপরিসীম দুঃখ-দুর্গতি উপস্থিত হইল। শ্রমাবসন্ন যোদ্ধৃবৃন্দ ইন্ধনের অভাবে অপক্ক অন্ন আহার করিয়া, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিল। হিমক্লিষ্ট কম্পিত কলেবর জীর্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া তাহারা অতিকষ্টে অর্দ্ধমৃতবৎ রাত্রি যাপন করিত; আর্দ্র ভূমিশয্যায় শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। তথাপি জাতীয় গৌরব ও মর্য্যাদা-রক্ষার্থ তাহারা প্রকৃত বীরের ন্যায় অম্লান-বদনে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে আর কত সহ্য হয়! অনশন-ক্লিষ্ট শ্রান্তক্লান্ত শীতার্ত্ত সৈন্যগণ অচিরে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শত শত রুগ্ন সৈনিক হাসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ, পরিমিত বস্ত্র, সুপথ্য ও নিয়মিত শুশ্রূষার অভাবে বহু বীরপুরুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে যে, যুদ্ধকালে

উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে হাসপাতালে ১৮,০৫৮ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ১,৫৯৮ জন। হাসপাতালের অবস্থা তখন কিরূপ শোচনীয় ছিল, ইহা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তথায় কয়েক-জনমাত্র শুশ্রূষাকারিণী ছিল। পীড়িত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই একে অপরের সহায়তা করিত। ঔষধ-পত্র ও অস্ত্রাদির অভাবে চিকিৎসকগণ নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহেরও কোনরূপ সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। সর্ব্বত্র অভাব বিরাজ করিতেছিল।

এই সকল হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া পরদুঃখকাতরা, স্নেহ-প্রবণা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি হতভাগ্য পীড়িত সৈন্যগণের ক্লেশলাঘবে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসচিবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক এই সময়ে যুদ্ধসচিবও অনন্যোপায় হইয়া আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার ভার-গ্রহণের জন্য কুমারী ফ্লোরেন্সের সাহায্য-প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। সুতরাং উভয়ে উভয়ের পত্র পাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। দেশবাসী সকলে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মহাপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, 'উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত কার্য্যের ভার এতদিনে অর্পিত হইল। অচিরে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের ম্লানদৃশ্য অপসারিত হইবে।"

এই স্বদেশ-প্রেমিকা নাইটিংগেল ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডার্বিসায়ারের অন্তর্গত লিহার্ষ্ট ও হ্যাম্পসায়ারের অন্তর্গত এম্‌ব্লে পার্কের ভূম্যধিকারী উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিংগেলের সন্তান। ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে, সোমবার, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাতাপিতার মধ্যমা কন্যা। ফ্লোরেন্স নগরে ইঁহার জন্ম হওয়ায় ঐ নগরের নামানুসারে ইঁহারও নাম ফ্লোরেন্স রাখা হয়। মাতাপিতার তত্ত্বাবধানেই ইঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শৈশবকাল হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রীতির ভাব দেখা যাইত। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুকও বৈচিত্র্যময় ছিল। সেই বাল্য বয়সেই তিনি তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকাগুলির শুশ্রূষা করিতেন ও তাহাদিগের আহত স্থানে বন্ধনী বাঁধিয়া দিতে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে যে কার্য্যের ভার লইতে হইবে স্বয়ং বিধাতৃ-পুরুষ যেন শৈশব হইতেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্য শিক্ষা দিতেছিলেন। কথিত আছে কোনও এক দরিদ্র মেষপালকের একটি কুকুর সর্ব্বপ্রথম রোগিরূপে কুমারীর শুশ্রূষা লাভ করে। জীব-জন্তু হইতে ক্রমে তিনি আর্ত্ত-মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। যেস্থানে দুঃখ, ক্লেশ ও রোগের যাতনা, সেই স্থানেই তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজ করিত। মানব-সেবায় সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই পিতার অধিকারভুক্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়, রোগি-নিবাস, সংশোধনাগার ও জনসেবার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যকলাপ তিনি মনোনিবেশসহকারে পরিদর্শন করিতেন।

নাইটিংগেল অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা নারী ছিলেন। যৌবনের প্রথম ভাগেই, তিনি তাঁহার প্রতিবেশিনী বালিকাদিগকে বাইবেল-শিক্ষাদিবার জন্য একটি 'ক্লাশ' খোলেন এবং শিশুচিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর তিনি ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের অনেক হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হন যে, ইংলণ্ডের হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী সুশিক্ষিতা নারীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব দূর করিয়া হাসপাতালের দুর্দ্দশামোচনে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

তখন জর্ম্মণীতে শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় ছিল। এই স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, শুশ্রূষাসম্বন্ধে তিনি মনে মনে যে সকল ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা এখানে কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুতরাং তিনিও নিজে রোগীর শুশ্রূষা-বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ছয়মাস এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই স্থান হইতে তিনি ফ্রান্সের প্যারিনগরে গমন করেন। তথায় সেবার বিবিধ বিধি ও রোগিনিবাস-পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হন। একবৎসর বিশ্রামের পর তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিলেন এবং স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি আর্ত্ত-মহিলা-সেবাসদনের প্রতিষ্ঠা করিয়া রোগীর সেবায় তাঁহার অধিকাংশ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দুই বৎসরের মধ্যে এই নূতন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিল। প্রথম চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল এবং তিনি বাধ্য হইয়া বিশ্রামলাভের জন্য পিতৃভবনে গমন করিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই যে দেবকার্য্য সাধন করিয়া তিনি বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর চৌত্রিশ জন শুশ্রূষা-নিপুণা সঙ্গিনীসমভিব্যাহারে নাইটিংগেল কঠোর দায়িত্বভার

স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দকোলাহলের মধ্যে ক্রিমিয়ায় যাত্রা করিলেন। দেবগণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল। এই শুশ্রূষাকারিণীদিগের মধ্যে অনেকে সামাজিক পদমর্য্যাদায় ও সৌভাগ্য-সম্পদে গৌরবান্বিতা ছিলেন।

নবেম্বর মাসের ৫ই তারিখে তাঁহারা স্কুটারীতে অবতরণ করেন। স্কুটারী-নগরটী তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের অনতিদূরে বস্‌ফোরাস প্রণালীর অপরতীরে অবস্থিত। এই স্থানে একটি বড় হাসপাতাল ছিল। তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইহা আহত ইংরাজ সৈনিকের আবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। হাসপাতালে প্রবেশ করিয়াই নাইটিংগেল এক লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা। আহত সৈনিকপুরুষেরা রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সেবাশুশ্রূষা করিবার লোক নাই। কেহ বা জ্বরাক্রান্ত, কেহ বা আমাশয়-রোগে শয্যাশায়ী, কেহ বা যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত। রুগ্ন-ব্যক্তিগণের শয্যা ধূলায় মলিন, বহুদিন যাবৎ তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে না। গৃহের দরজা-জানালার সুবন্দোবস্ত নাই, বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যালোকের পথ রুদ্ধ। সৈন্যগণ দিন দিন ক্ষীণ ও ম্লান হইতেছে। রোগীদিগের উপযুক্ত পথ্যের পর্য্যন্ত সংস্থান নাই। মৃত্যুবিভীষিকা সকলের ম্লান মুখচ্ছবিতে প্রতিভাত হইতেছে।

যাহারা স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া এবং বন্ধুবান্ধব ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, জাতীয় সম্মান ও দুর্ব্বলের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ বিদেশে ভীষণ রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিল, অবশেষে তাহারাই আজ বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষার মৃত্যুদ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। এই শোকাবহ-দৃশ্য-দর্শনে

নাইটিংগেল একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার পাত্রী ছিলেন না। তাই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বীয় সঙ্গিনীগণকে লইয়া তিনি উৎসাহভরে শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। একদল রুগ্ন-ব্যক্তিগণের গৃহ ও শয্যা পরিষ্কার করিয়া তাহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন; অপরদল লইয়া নাইটিংগেল স্বয়ং রন্ধনশালায় গমন করিলেন। পরম যত্নে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহারা রুগ্ন-সৈনিকগণকে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইলেন। এইরূপে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর সেবায় তাঁহারা প্রাণমন সঁপিয়া দিলেন।

রোগীর সেবায় মানুষ ইহার পূর্ব্বে কখনও এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। রুগ্নব্যক্তিগণের রোগযন্ত্রণা-লাঘবের উপায়-উদ্ভাবন-চিন্তায় কুমারী ফ্লোরেন্স তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখনও তিনি অঙ্গব্যবচ্ছেদ-ভীত রোগীর পার্শ্বে বসিয়া অভয় দিতেছেন, সৈনিক-পুরুষগণের শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কখনও তাহাদের জন্য পত্র লিখিয়া দিতেছেন, কখনও বা তাহাদের পারিবারিক অবস্থা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাহারাও সরল অন্তঃকরণে সুখদুঃখের করুণ কাহিনী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছে। রুগ্ন ব্যক্তিগণের প্রফুল্লতা-সম্পাদনের জন্য তিনি নানাপ্রকার সুপাঠ্য-পুস্তক-পরিপূর্ণ পাঠাগার স্থাপন এবং তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নানাপ্রকার প্রীতিপ্রদ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন।

রোগীর সেবায় নাইটিংগেল অপরিসীম বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন; ইহাতে তাঁহার ক্লান্তিবোধ ছিল না। এমন কি প্রতিদিন এই সময় উপর্য্যুপরি ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। হাসপাতালের কর্ম্মচারিবৃন্দ সর্ব্বদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর

শ্রান্তক্লান্তদেহে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিত, যখন হাসপাতাল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নীরব ও নিস্তব্ধ, সেই নিশীথ-সময়ে নাইটিংগেল, স্নেহবৎসলা ও উদ্বিগ্না জননীর ন্যায়, প্রদীপ-হস্তে একাকিনী ধীরপাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করিয়া রোগীদের অবস্থা নিজচক্ষে অবলোকন করিতেন। রোগযন্ত্রণাগ্রস্ত অর্দ্ধ-নিদ্রামগ্ন সৈন্যগণ স্বর্গরাজ্যের দেববালার হস্তসংস্পর্শে যেন ক্ষণেকের তরে এক অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিত। কেহ বা সেই মূর্ত্তিমতী দয়ার সুখশীতল ছায়া-সংস্পর্শে সকল রোগ-যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইত। তাঁহার সেবার সুব্যবস্থাগুণে রোগীদিগের মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা ৪২ হইতে মাত্র ২ জনে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই দারুণ পরিশ্রমে একবার তিনি স্বয়ং জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি সৈন্যদিগকে তথায় ফেলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সৈনিকগণ যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তিনিও সেই সময়ে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

কুমারী নাইটিংগেলের এই অলৌকিক সেবাপরায়ণতা ইংলণ্ডের ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিল। ফ্লোরেন্সকে একখানি যুদ্ধজাহাজে করিয়া স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব করা হইল এবং লণ্ডননগরী তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজনও করিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, এবং সেই প্রেমেরই বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা যশ চাহেন না, সম্মান চাহেন না, নিজের কীর্ত্তি-ঢক্কা নিনাদিত করিতে চাহেন না;— চাহেন কর্ম্মান্তে নীরবতা। তাই কুমারী নাইটিংগেল তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা যেই শুনিতে পাইলেন,

অমনি তিনি নীরবে একখানি ফরাসী-পোতে আরোহণ করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেশবাসীর সকল আয়োজন পণ্ড করিয়া দিলেন।

এখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বীয় গ্রাম্য আবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেশবাসী তাঁহার অক্লান্ত সেবায় মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাহার হস্তে যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তিনি শুশ্রূষাকারিণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 'নাইটিংগেল হাউস্' নামে একটি শিক্ষালয় ও কয়েকটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সৈনিক-রোগিনিবাস, সৈনিক-চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনবিষয়েও তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইংলণ্ডে দলে দলে লোক শুশ্রূষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। জীবনীশক্তি রক্ষার জন্য নির্ম্মল বায়ু, আলোক, উপযুক্ত উষ্ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও উপাদেয় পথ্য রোগীর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় এবং রোগীকে এই সকল অবস্থার মধ্যে রক্ষা করাই প্রকৃত সেবার কার্য্য। এই তত্ত্ব তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে প্রচার করেন।

কুমারী নাইটিংগেল দেশের স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতিবিধানের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তখন কি স্বদেশে কি বিদেশে, রোগিনিবাস-স্থাপনের কথা হইলেই তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইত। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, নির্ম্মল বায়ু-চলাচল, জলনিঃসরণ, রোগবীজ-নাশের উপায়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে কুটিরবাসীদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত 'কাউণ্টি কাউন্সিল টেক্নিক্যাল ইনষ্ট্রাকশন কমিটী'-নামক সভার সাহায্যে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড তাঁহাকে এক প্রশংসা-সূচক উপাধি দান করেন। অবশেষে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন

অন্তে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী রমণী ইহলীলা সংবরণ করেন।

নাইটিংগেল পরার্থপরতার যে সমুজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ। তাঁহার পুণ্যপূত স্মৃতিকাহিনী চিরদিন মানব-হৃদয়ে ভক্তি, বিস্ময় ও আনন্দের উৎসস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে। তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার সেবাধর্ম্ম ও তাঁহার সাধনা স্বার্থ-চিন্তারত মানবমণ্ডলীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

## স্ত্রীজাতির মঙ্গলবিধানে

# রমাবাই সরস্বতী।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

—দ্বারকানাথ।

ভারতীয় রমণীগণকে স্বর্গবিচ্যুত দেববালা বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহাদের অভীপ্সিত। তাই কোমলতা, স্নেহমমতা, আত্মত্যাগ ও পরসেবায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারা গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। পরিবারভুক্ত লোকগণের সুখশান্তি-বিধানের জন্য তাঁহারা অহোরাত্র ব্যস্ত। ভাল ভাল আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কিরূপে তাঁহারা পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের মনস্তুষ্টি বিধান করিবেন, রোগে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কিরূপে স্বজনের রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিবেন, শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কি উপায়ে তাঁহারা শোক সন্তপ্তচিত্তে শান্তিবারি সেচন করিবেন, বিপৎকালে মন্ত্রণা দিয়া কিরূপে তাঁহারা অস্থিরচিত্তে স্থৈর্য্য-প্রদান করিবেন—এই সকল চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখে। নিজের কথা কখনও তাঁহারা ভাবেন না বা নিজের সুখ তাঁহারা কখনও অন্বেষণ করেন না। নিজের দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। পরিবারস্থ সকলকে সুখে রাখিতে পারিলেই তাঁহারা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; পরসেবায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন

করিতে পারিলেই তাঁহারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ভারতীয় নারীর এই দুর্লভ চিত্র কোনও কোনও লোকের কামলাদোষদুষ্ট চক্ষে হয়ত পীড়নের চিত্র বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু যাহারা ভারতের নারী-চরিত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতীয় নারীগণ পরসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে কিরূপ অভুতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বীয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহাদের স্নেহ-মমতা ও প্রেমরাজ্য শিক্ষাগুণে যেদিন বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে, সেদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল ও মেঘনির্ম্মুক্ত হইবে। ভারতের নারীসমাজে পরসেবার যে নিঃস্বার্থভাব সুপ্ত রহিয়াছে, শিক্ষা-প্রভাবে তাহা জাগরিত হইলে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা অননুমেয়। ভারতীয় নারী নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কত মঙ্গলসাধন করিতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

দাক্ষিণাত্যে মেঙ্গালোর জেলায় অনন্ত শাস্ত্রী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে একজন শাস্ত্রবিশারদ্ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই উদার মত পোষণ করিতেন। শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই—এই অনুদার মতের পোষকতা তিনি কখনও করিতেন না। সুতরাং তিনি নিজের পত্নী লক্ষ্মীবাইকে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের প্রবেশ-দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেন। তদীয় ধর্ম্মপিপাসু পত্নী নারীজাতি-সুলভ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা-বলে সংস্কৃত-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

এইরূপ শিক্ষিত মাতাপিতার গৃহে রমাবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষার ভার তদীয় মাতার উপর অর্পিত

হয়। মায়ের চরিত্রের প্রভাব কন্যার উপর সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। রমাবাই নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মায়ের স্নেহপূর্ণ সদুপদেশাবলীই তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবনের আলোকস্বরূপ হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতাপিতাহীন হন; কিন্তু এই অল্পবয়সের মধ্যেই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে ও মাতাপিতার সুশিক্ষাগুণে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি আরও অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। মরাঠী ত তাঁহার মাতৃভাষাই ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কানারী, হিন্দুস্থানী ও বঙ্গভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

এতাবৎকাল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তিনি স্বীয় ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার নানাপ্রকার আলোচনা হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও অকাট্য যুক্তিবল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হন এবং তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এখানে তাঁহার অদৃষ্টে এক দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হয়; তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এই অসহায় অবস্থায় শ্রীহট্টনিবাসী এক বাঙ্গালী যুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ বহুদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটি কন্যা-সহ তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া তদীয় স্বামী পরলোক গমন করেন। রমাবাই শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং নিজের জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও তিনি সুখের সন্ধান পাইলেন,—এই অশুভ ঘটনার

মধ্যেও তিনি বিধাতার শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাইলেন, এবং স্বকীয় স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই মহাসাধনায় আনন্দীবাই যোসী তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন এবং অর্থসাহায্য ও নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুর্গতিদর্শনে রমাবাই সরস্বতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের দুর্দ্দশামোচন তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন, এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষার পথে প্রধান কণ্টক; সুতরাং তিনি এই কণ্টকের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদ্বারা জনসাধারণকে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে কাতরপ্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বোম্বাই সহরের অধিবাসিগণ তাঁহার শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন ও বাল্যবিবাহপ্রথানিবারণ—এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া তথায় আর্য্য-মহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজও স্থাপিত হইল।

কিন্তু ভারতের সমাজ তখনও মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করা এক দুরূহ ব্যাপার। রমাবাই দেখিলেন যে, নিজ দেশবাসীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে, হয়ত, তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে না,—হয়ত ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। তাই তিনি সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ-জাতির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আরব্ধকার্য্যে উদার-হৃদয় ইংরাজগণের সহায়তা-লাভের আশায়, তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরাজি-ভাষা ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু জানিতেন।

এখন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তিনি চেল্‌টেনহাম মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরাজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দীবাই যোশী আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি রমাবাইকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তখনও খুঁজিয়া পান নাই। তখন স্বনামধন্য জর্ম্মাণশিক্ষা-সংস্কারক ফ্রোবেলের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী রমাবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, তিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন—"ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমি লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রকৃত সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ হয়। কাজেই এই শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণ, সুতরাং এই শিক্ষাপ্রণালী ভারতে অনুসৃত হইলে কুসংস্কারমূলক মোহান্ধকার হইতে ভারতসমাজ নির্ম্মুক্ত হইবে, এবং বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া ভারতললনা স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে।"

তিনি আরও বলিতেন—"আমি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের

মাতৃহৃদয় অধিকার করিতে বাসনা করি। সন্তানের মঙ্গলেচ্ছা মাতৃহৃদয়কে যেরূপ আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপর কিছুই ইহাকে সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী যদি তাহাদের সম্মুখে যথোপযুক্তভাবে সমুপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা জননীর উপর নির্ভর করে। যদি ভারতীয় রমণীগণ শিশুসন্তানগণের শিক্ষার জন্য বুদ্ধি ও বিবেচনা-পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয় স্বতঃই স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।"

রমাবাই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন করিতে মনন করেন, এবং উক্ত শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভের জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। তথাকার সুন্দর সুন্দর চিত্রসংবলিত, পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত, শোভন মলাটযুক্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মারাঠী ভাষায় শিশুদের জন্য ঐ প্রকার পুস্তক প্রকাশ করিবার মানসে তিনি আমেরিকায় অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করেন। এখন বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, বহু পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। পণ্ডিতা রমাবাই প্রায় তিনযুগ পূর্ব্বে যে সত্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী এতদিন পরে সে সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তথাকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া রমাবাইয়ের স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি ঘৃণিত, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাকুলের দুর্দ্দশামোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাথ আশ্রয়হীন বিধবাগণ আমাদের সমাজে কিরূপ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে, গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদিগকে কিরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদান করে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহার উপায়-নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইলেন।

অচিরকালমধ্যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিধবাগণের দুঃখদুর্দ্দশামোচন তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু-বালবিধবাদের দুঃখ-নিবারণোদ্দেশ্যে আমেরিকায় বোষ্টন নগরে "রমাবাই-সমিতি" নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর সহানুভূতিলাভ-প্রয়াসে রমাবাই 'উচ্চজাতীয় হিন্দুস্ত্রী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। হিন্দুসমাজে বাল-বিধবাগণের জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে, উক্ত পুস্তকে তিনি তাহা প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন।

ভারত-সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, সমাজ তাহার উপর কিরূপ নির্ম্মম ও কর্কশ ব্যবহার করে,—তাহা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে বাল্যবিবাহ-প্রথা, বালিকাবধূর

প্রতি শাশুড়ীর অত্যাচার, শিশুকন্যা-হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা-সমূহও আমেরিকাবাসীর গোচরীভূত করিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুঃখ-মোচনে তাহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করেন। এইরূপে দুই বৎসরকাল আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় ষাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যের সূচনার জন্য দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি বোম্বাইনগরে পদার্পণ করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে তথায় 'সারদা-সদন' নামে এক বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিধবাশ্রমে 'বাইবেল' শিক্ষা দিবার জন্য অনেক মিশনারী বন্ধু তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রমাবাই নিজেও কালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার স্বভাবতঃই একটা টান ছিল। কিন্তু যে উদার ভাব লইয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী স্থাপন করিয়া তাহা অনুদার-ভাবদুষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিশ্বমানবের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতিধর্ম্ম বা দেশকালের ভেদাভেদ কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সার্ব্বভৌমিক প্রেমের বন্যা যে হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাঁধ কি সেখানে টিকিতে পারে? তিনি দেখিলেন যে, বিধবাশ্রমে বাইবেল-পাঠ বাধ্যতামূলক করিলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে—তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত বিধবাশ্রমে স্থান পাইলে, হিন্দুবিধবাগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। সুতরাং ভারতের নিগৃহীত দুঃস্থ হিন্দুবিধবাগণের দুর্গতিবিমোচনে তিনি কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। তাই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয়

বিধবাদিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল। তিনি মিশনারীগণের বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ-সহকারে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারীহিত-কার্য্যে তাঁহার পূতজীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শেষ জীবনে তিনি এই বিধবা-আশ্রমটি তাঁহার জন্মস্থান পুনার অন্তর্গত কালগাঁও গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এই আশ্রমে ইদানীং নানা বয়সের প্রায় পনর শত নারী ও বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। এক্ষণে এই আশ্রমের নাম মুক্তিভবন রাখা হইয়াছে। এইরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে সমস্ত জীবন স্ত্রীজাতির সেবায় উৎসর্গ করিয়া অবশেষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তিনি কর্ম্মময় জীবন হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

## দেশ-সেবায়

# গোখ্‌লে।

"যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ভারতের একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক, অক্লান্তকর্ম্মা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, আজ কয়েক বৎসর হয়, ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুণ্যপূত চরিতকাহিনী আজও ভারতবাসীমাত্রই আগ্রহভরে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে শ্রবণ করিতেছে। তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। শুধু দেশবাসীই যে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছে, তাহা নহে। দেশের রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অভাবে নিজদিগকে অভাবগ্রস্ত মনে করিতেছেন। কি গুণে দেশবাসী জনসাধারণের ও রাজপুরুষগণের হৃদয় তিনি সমভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? বংশগৌরবে? না, তাঁহার ন্যায় সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ভারতে অসংখ্য বিদ্যমান। ধনসম্পদে? না, তিনি গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই। বিদ্যাবত্তায়? না, তাঁহার ন্যায় অনেক বিদ্বান্ এদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তবে কি বাগ্মিতায়? না, তাঁহার ন্যায় বাগ্মী সরস্বতীর কৃপায় ভারতে কম জন্মে নাই। তবে কি গুণে আজ

তিনি গণ্য, মান্য ও বরেণ্য? তাঁহার অনন্যসাধারণ ত্যাগধর্ম্ম ও নিঃস্বার্থ দেশসেবা, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম তাঁহাকে দেশেবাসীর নিকট দেবতুল্য করিয়া তুলিয়াছে।

তিনি ভারতবাসীর সম্মুখে আত্মসংযম, সেবা ও ত্যাগধর্ম্মের যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী অসংযতচরিত্র যুবকগণকে সুপথে পরিচালিত করিবে, তাহা ভোগসুখরত ব্যক্তিগণকে কশাঘাতে জাগরিত করিয়া তুলিবে, তাহা মৃতপ্রাণ ভারতসমাজে চিরকাল বল সঞ্চার করিবে। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের হৃদয়ে ন্যায়ানুরাগ বর্দ্ধিত করিবে, এবং এইরূপে দেশসেবা ও রাজসেবার মধ্যে বিরুদ্ধভাব দূর করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

"ভারত-সেবক-সম্প্রদায়" গোখ্‌লের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তিনি যে ভারত-সেবক-সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্। রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি সেই আদর্শের মূলমন্ত্র। রাজভক্তিহীন স্বদেশপ্রীতি দেশের প্রকৃত উন্নতির সহায়তা না করিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব আনয়নপূর্ব্বক অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি করে। তাই গোখ্‌লে "ভারত সেবক-সম্প্রদায়ের" উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

"ভারত সেবকগণ" ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের উন্নতিকল্পে বিধাতার শুভবিধান বলিয়া অকপটহৃদয়ে গ্রহণ করিতেছে। এই বিধাতৃবিধানের প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, তদধীনে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুরূপ শাসনপ্রণালী ভারতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা ভারত সেবক-সম্প্রদায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজপুরুষগণের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, প্রকৃত সেবক স্বীয় দেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। এইরূপে সংযতভাবে বিধিমত উপায়

অবলম্বন করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।"

বস্তুতঃ, গোখ্‌লে তাঁহার জীবনে এই আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অক্লান্তভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য দুঃখকষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন। যেরূপ বিধানে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা নির্ভীকচিত্তে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের গোচরীভূত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। আবার যেরূপ অনুষ্ঠানে দেশের অকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিত, রাজপুরুষগণের সেইরূপ কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ করিতেও তিনি কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার বিশেষ একটি গুণ ছিল যে, তিনি ধীর-স্থির ভাবে, যুক্তির পর যুক্তি অবলম্বন করিয়া, সংযতভাবে রাজকর্ম্মচারিগণের ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহাদের প্রতি তিনি কখনও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন না। ভাবপ্রবণতার আশ্রয় না লইয়া বাস্তব ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত তাঁহার অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করিতেন যে, রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার যুক্তির সারবত্তার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইজন্যই তিনি রাজপুরুষগণের নিকট এত সম্মানলাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা গোখ্‌লেকে ভারত সাম্রাজ্যের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

গোখ্‌লে ভবিষ্যৎ কালে যে একজন গণ্যমান্য লোক হইবেন, ইহার সূচনা তাঁহার প্রথম জীবনেই সূচিত হয়। তিনি বি-এ উপাধি লাভ করিয়াই "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাদান-সমিতিতে" যোগদান করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; সংসারে অর্থের অসচ্ছলতাজনিত অভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। ইচ্ছা করিলে, তিনি স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি-

বলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু শিক্ষালোকবঞ্চিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, নিজের কথা ভাবিবার সময় তাঁহার কোথায়? তাই তিনি সাংসারিক ভোগবিলাসের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, অম্লানবদনে প্রকৃত ত্যাগীর ন্যায় চিরদরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইলেন। পোষাকপরিচ্ছদ, আহারবিহার প্রভৃতি বিষয়ে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি সমাজ-সেবকের প্রকৃত আদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে ধারণ করিলেন।

"দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতি" গোখ্‌লের অগ্রবর্ত্তী কতিপয় সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় ও উদ্যোগে স্থাপিত হয়। দেশমধ্যে অল্প-ব্যয়ে শিক্ষাসম্প্রসারণকল্পে এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির অধীনে কতকগুলি বিদ্যালয় আছে। পুনার ফার্গুসান কলেজও এই সমিতি-কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই সমিতির আজীবন সভ্যগণ পরার্থপরতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। দেশের সুশিক্ষিত ধীসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ফার্গুসান কলেজে নামমাত্র বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন। যত বড় বিদ্বান্ হউন না কেন, এখানে ৭৫৲ টাকা বেতনে বিংশতি বৎসর কাল কাজ করিতে তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিছু দিন পূর্ব্বে কেম্ব্রিজের সিনিয়র র‍্যাংলার পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন। গোখ্‌লেও এই সমিতির আজীবন সভ্য ছিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্যমাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়া ফার্গুসান কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন।

শিক্ষাপ্রচারকার্য্যকে তিনি জীবনের সুমহৎ ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতেই তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেন নাই। শিক্ষকতাকালে তিনি দেশসেবার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ

করিবার জন্য দেশের অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি নানাবিষয়ের জটিল প্রশ্নসমূহ গভীর অধ্যবসায় ও যত্নসহকারে আলোচনা করেন, এবং অবশেষে অধ্যাপকতাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজনীতিচর্চ্চাসম্বন্ধে তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া যে পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত উহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে যখনই তিনি অবতীর্ণ হইতেন, তখনই প্রতিপক্ষদলের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইত। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, অকাট্য যুক্তি ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সুখ্যাতি লোকমুখে ধরিত না।

গোখ্‌লে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। তথায় তিনি দেশহিতকর অনেক প্রশ্নের অবতারণা করেন। সে সকল প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই সর্ব্বপ্রধান। তিনি যখন দেখিলেন যে, ভারতে হাজার করা ৫৯ জন লিখিতে পড়িতে পারে এবং ৯৪১ জনই নিরক্ষর, তখন তিনি দেশের জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এই প্রশ্নটি তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ ধীরতার সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং বিভিন্নদেশের প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় ইতিহাস অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন আমেরিকায় এবং য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র আইনের সাহায্যে বাধ্য করিয়া লোকদিগকে লেখাপড়া শিখান হয়। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার অবস্থা এশিয়ার অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। তাই তিনি এশিয়ার দেশসমূহের শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন জাপানে এবং এমনকি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। প্রতিপক্ষদল

পাছে এই তর্ক তোলে যে, সে সকল দেশ হইতে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাই তিনি ভারতের করদ ও মিত্র রাজ্যসমূহের শিক্ষার ইতিহাস হইতে দেখাইলেন যে, ভারতের মধ্যেই বরদারাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

এই সকল দেখাইয়া, তিনি ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেশমধ্যে লোক-মত গঠন করিবার জন্য তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতসমূহের বহুল প্রচার করেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া জনসাধারণ আকৃষ্ট হইল। এমনকি রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যদিও সেই প্রস্তাব এখনও সর্ব্বত্র আইনে পরিণত হয় নাই, তথাপি গোখ্‌লে এ বিষয়ে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। অচিরেই তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশেষরূপে না ভাবিয়া চিন্তিয়া, গোখ্‌লে কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আবার যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, সে বিষয়ের সমাধান করিতে বিপদের সম্মুখীন হইতেও তিনি ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। রাজপুরুষদিগকে অনর্থক বিব্রত করিয়া তুলিতে তিনি কখনও ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন নাই, অথবা তাহাদের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে কখনও কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। গোখ্‌লের স্বদেশপ্রেমের আদর্শে বিদ্বেষভাবের লেশমাত্র ছিল না। রাজানুশাসনের প্রতি প্রজোচিত ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া, ভয় ও প্রলোভনের অতীত হইয়া তিনি প্রতিকার্য্যে স্বদেশহিতৈষণার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

প্রকৃত কর্ম্মীর আদর্শ গোখ্‌লে তাঁহার জ্বলন্ত ভাষায় এইরূপ

বর্ণন করিয়াছেন—"কর্ত্তব্যপথ নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নসঙ্কুল; প্রলোভন পদে পদে আমাদিগকে বিপথগামী করিতে চায়; ব্রতধারীর সঙ্কল্পপরীক্ষার্থ নানাপ্রকার নৈরাশ্য পুনঃ পুনঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাফল্যলাভের প্রধান কথা এই যে, উপযুক্ত সংখ্যক দেশবাসী দেশসেবাকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিয়া আগ্রহ ও উৎসাহভরে তাহাতে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিবে। দেশসেবাকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। স্বদেশপ্রেমে আমাদের হৃদয়কে এরূপভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে যে অন্যভাব যেন তথায় স্থান পাইতে না পারে। দেশমাতৃকার সেবায় যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইলে যে স্বদেশপ্রেম আহ্লাদে আত্মহারা হয়, বাধাবিঘ্ন বা বিপদ্ উপস্থিত হইলে যে হৃদয় কর্ত্তব্যপথ হইতে পশ্চাৎপদ না হইয়া নির্ভীকভাবে তাহাদের সম্মুখীন হয়, যে ভগবদ্বিশ্বাস সকল অবস্থাতেই অচল ও অটল থাকে, এইরূপ জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, এইরূপ নির্ভীক হৃদয়, এইরূপ গভীর বিশ্বাসকে সহায় করিয়া, প্রকৃত কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এবং স্বকীয় দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ও আনন্দ অনুভব করিবেন।"

# শিশুর শিক্ষায়

# ডাক্তার মন্টেসরী।

"ক্ষুদ্র এ মাথার'পর রাখগো করুণ কর,
উহারে করোনা অবহেলা ;
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

এই বিংশ-শতাব্দীতে যিনি শিশুর শিক্ষারাজ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি একজন বিদুষী রমণী। গত শতাব্দীতে ফ্রোবেলের 'কুমার-কানন' বিদ্যালয় যেরূপ সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই রমণীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সেইরূপ সমস্ত সভ্য-জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে বহু তত্ত্বপিপাসু নরনারী এই বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালী দেখিবার জন্য রোমনগরে আগমন করিতেছেন। যে ইতালী শিক্ষাদীক্ষা-ব্যাপারে এতদিন য়ুরোপের অন্যান্য সভ্যদেশ ও আমেরিকার অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল, আজ সেই ইতালী দেশের একজন রমণী শিক্ষারাজ্যের পথ-প্রদর্শকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা ইতালীর পক্ষে যেরূপ শ্লাঘার কথা, রমণীজাতির পক্ষেও তদ্রূপ গৌরবের বিষয়।

এই রমণীর নাম মন্টেসরী। ইনি রোম-নগরের মহিলা ডাক্তার। চিকিৎসাকালে ইঁহাকে শিশুদিগের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিতে হইত। মস্তিষ্কের পরীক্ষাব্যাপারে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাহা

হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক শিশুগণের শিক্ষাদানের প্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। এইরূপে শিশু লইয়া কার্য্য করিতে করিতে তিনি শিশুদিগের বুদ্ধবৃত্তি ও মানসিক-শক্তি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাগারে স্বকীয় গবেষণা-বলে তিনি যে সকল শিক্ষা-সূত্র উদ্ভাবন করেন, সে সকল অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের একাগ্রতা ও সমাজ-সেবকের হৃদয় লইয়া, তিনি শিশুর শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের ও ফ্রোবেলের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় যে, কেহ কেহ মন্টেসরীর নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে এক প্রকার কুমার-কানন-বিদ্যালয় বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে যে মন্টেসরী নূতন কথা প্রচার করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ সকল মূলসূত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে তিনি যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

মন্টেসরীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম "শিশুগৃহ"। "শিশুগৃহ" এই নামের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য বা সার্থকতা আছে। এই বিদ্যালয়ে শিশুগণ নিজগৃহের ন্যায় স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে বিচরণ করে। বিদ্যালয়-গৃহকে কারাগার-তুল্য অপ্রীতিকর স্থানে পরিণত না করিয়া, উহাকে সর্ব্বতোভাবে গৃহের ন্যায় চিরপ্রিয় ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও আয়োজন করা হয়। এই শিশু-বিদ্যালয় একটি প্রকাণ্ড গৃহ-বিশেষ। এখানে বিশুদ্ধ বায়ু-চলাচলের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে; ঘরে ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার সাজান রহিয়াছে। সেগুলি এত হাল্কা যে, শিশুগণ অনায়াসে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে লইয়া যাইতে পারে। বাহিরের দিকে যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান; সেখানে শিশুগণ ছুটাছুটি ও খেলা করে।

প্রতি প্রকোষ্ঠে মাত্র ত্রিশটি শিশুর শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একজন তত্ত্বাবধায়িকা বা শিক্ষয়িত্রী, ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তিতে অথচ অবহিতচিত্তে, বসিয়া আছেন। শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতেছে এবং কখনও কখনও শিক্ষয়িত্রীর নিকট উপদেশগ্রহণের জন্ম নিজ হইতেই আগমন করিতেছে। শিক্ষয়িত্রী অনাহূতভাবে গায়ে পড়িয়া শিশুদিগকে কোন কথাই বলিতেছেন না। গৃহের এক কোণে একটি পিয়ানো রহিয়াছে। কোনও শিশু পিয়ানোর পাশে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও খেলা করিতেছে; কোনও শিশু বা ক্লান্তি অনুভব করিয়া গৃহতলে বিস্তৃত সুকোমল গালিচার উপর শুইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে কোমল-মতি শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ সুন্দর সুন্দর ছবি ঝুলান আছে। কোথাও বা শিশুদিগের জল-সেচন-পরিপুষ্ট গাছপালা জানালার পশ্চাতে পাত্রবিশেষে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও বা গৃহের এক কোণে হাত-মুখ ধুইবার জন্ম জলপূর্ণ পাত্র আছে এবং উহার আশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট বাটী ও কলসী পড়িয়া রহিয়াছে। খেলিতে খেলিতে যখন হাতে মুখে মাটি লাগিতেছে, তখন শিশুগণ এখানে আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ গৃহে মাতা শিশুগণের জন্ম যে সকল ব্যবস্থা করেন, এখানে তাহার কোন ত্রুটি হইতেছে না। সুতরাং এ বিদ্যালয়ের ‘শিশুগৃহ” আখ্যাটি অতিশয় উপযোগী হইয়াছে।

শিশুদিগের হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্ম এখানে অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করা হয়। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শিশুগণ বিদ্যালয়-গৃহ নিজ-হস্তে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে; নিজেরাই হাতমুখ ধুইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রাতঃকালীন বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়। তাহারা পরস্পরকে ভাইবোনের ন্যায় ভালবাসে। কখনও কখনও কঠিন প্রশ্নের

সমাধানের জন্য তাহারা দুই তিন জন মিলিয়া এক একটি দল করে; কখনও কখনও চারি পাঁচ জন মিলিয়া দল বাঁধিয়া খেলা করে; কখনও বা দশ বার জন মিলিয়া পিয়ানোর তালে তালে এক সঙ্গে নৃত্য করে। গৃহের বাহিরে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। সেখানে নানাপ্রকার সজীব গাছপালা ও সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ সজ্জিত রহিয়াছে। খেলায় মাতিয়া শিশুগণ সেখানে দলে দলে ছুটাছুটি করিতেছে। পড়া-শুনা করিবার জন্য কেহই তাহাদিগকে খেলা হইতে বিরত হইতে বলিতেছে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ সুবিধা ও স্বাধীনতা পাইয়াও তাহারা সর্ব্বদা ক্রীড়া-রত থাকিতে চায় না। কতকক্ষণ পরে নিজ হইতেই তাহারা লেখা-পড়া ও গণনা প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করে। স্বাধীনতার অপব্যবহার চিরাবরুদ্ধ শিশুগণ যেরূপ করে, ইহারা কখনও সেরূপ করে না।

আর এই সকল শিশুগণ যখন পড়াশুনা ও গণনা প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ে নিযুক্ত হয়, তখন সেদিকে তাহাদের এত গাঢ় অভিনিবেশ হয় যে, তাহারা সেই অল্প সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ শিক্ষা লাভ করে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী শিক্ষক-প্রদত্ত পাঠ হইতেও ছাত্রগণ সেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষার বিষয়গুলিকে নানাভাবে এরূপ চিত্তাকর্ষক করা হয় যে, শিশুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে সকল বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করে। জোর করিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয় না; কারণ, প্রকৃত শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উহার মূল্য অতি অল্প। মণ্টেসরী বলেন—

"প্রথমতঃ, শিশু নিজকেই নিজে শিক্ষা দিতে পারে; অপরের পক্ষে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। শুনিয়া শিখা বা দেখিয়া শিখা অপেক্ষা, নিজে করিয়া শিখার মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং শিশু প্রত্যেক বিষয় নিজের চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা করিবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

স্ব-ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিয়া শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি করে। পর-দত্ত শিক্ষায় তাহার জ্ঞানের উৎস বরং দিন দিন শুষ্ক হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাপ্রণালীকে শিশুর উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; শিশুকে জোর করিয়া কোনও বিশিষ্ট কল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগী করিবার চেষ্টা স্বভাববিরুদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, শিশু যেন শিক্ষা লাভ করিতে আগ্রহভরে নিজের ইচ্ছায় অগ্রসর হয়, এবং উহাতে সে যেন এরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, যাহা তাহার পক্ষে অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব।”

প্রাতঃকাল হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শিশুগণ সাধারণতঃ মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত শিশুশিক্ষার উপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি লইয়া কার্য্যে রত হয়। মধ্যাহ্নবেলা শিশুগণ নিজেরাই খাদ্যাদি পরিবেশনের বন্দোবস্ত করিয়া আহারে বসিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দিন ভিন্ন ভিন্ন দলের উপর এই ভার অর্পিত হয়। তাহারা আহারের টেবিল সাজাইয়া পানীয় ইত্যাদি আনয়ন করে এবং আহারের অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করে। এই ছোট ছোট শিশুদিগকে টেবিল সাজাইতে দেখিলে মনে এক অপরূপ আনন্দের উদয় হয়। চারি পাঁচ বৎসরের শিশুগণ ছুরি, চামচ, কাটা প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গীদিগকে বিলাইতেছে; কেহ কেহ বা থালাতে করিয়া একবারে ৫।৬টি জলপূর্ণ গ্লাশ লইয়া আসিতেছে; কেহ কেহ বা পাত্র ভরিয়া গরম স্থপ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে সঙ্গীদিগকে যোগাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই কোনরূপ ত্রুটি দেখাইতেছে না। কোন গ্লাশ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা স্থপ পড়িয়া যাওয়া প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না। এই সকল শিশুগণ কিরূপ ক্ষিপ্রতাসহকারে কার্য্য করিতেছে,

এবং অপরেরা কিরূপ সুসংযতভাবে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেছে, তাহা দেখিলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আহারাদির পর আবার শিশুগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কেহ কেহ খেলার মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে, কেহ কেহ ফুলের গাছে যত্নসহকারে জলসেচন করে, কেহ বা মনের সুখে আরামে যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমায়। কিন্তু অধিকাংশ শিশুই মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি লইয়া নানাভাবে অতিশয় আনন্দসহকারে সমস্ত সময়টুকু কাটাইয়া দেয়। মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলি বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে এরূপ যত্ন ও কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহাদের সাহায্যে আমোদপ্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতভাবে তিন হইতে সাত বৎসরের শিশুগণ নিজ হইতেই অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

মণ্টেসরী বলেন—"প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি অপর শিশুর প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আবার শিশুর প্রকৃতি চিরপরিবর্ত্তনশীল; নিত্যই নূতন। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে এক এক জন শিশুর জন্য এক এক জন শিক্ষকের প্রয়োজন।"

সকলের পক্ষে যদিও ইহা সম্ভবপর না হউক, শিক্ষিত জনক-জননীগণ এই শিক্ষকের স্থান অধিকার করিতে পারেন। আমাদের দেশের জনকজননীগণ শিশুর শিক্ষার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা জানেন না বা জানিতে চান না যে, শিশুর শিক্ষাভার নিজহস্তে লইলে যত সহজে ও স্বভাবানুমোদিত পথে তাঁহারা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, শিক্ষক শত শিক্ষিত হইলেও তাহা পারিবেন কি না সন্দেহ। শিশুর সরল মধুর বাক্য তাহাদের কর্ণকুহরে অমিয়ধারা বর্ষণ করে সত্য, শিশুর সদা-প্রফুল্ল হাসিমাখা মুখখানি তাহাদের প্রাণে বিমল আনন্দের তরঙ্গ উত্তোলন করে সত্য, শিশুর সজীব চঞ্চলভাব তাহাদের

প্রাণে নবীন জীবন দান করে সত্য, কিন্তু তাহারা পদে পদে উহার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া তাহারা নানারূপে উহার অনিষ্ট সাধন করে, শিশুর স্বাধীনতার উপর নানাপ্রকার অস্বাভাবিক বন্ধন আরোপ করিয়া নানাভাবে উহার স্বাধীন প্রকৃতিকে ব্যাহত করে, এবং অজ্ঞানতাবশতঃ উহার মনোবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি বিকাশের পথে নিত্য নূতন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করে।

বস্তুতঃ, বঙ্গদেশে প্রথম পাঁচ বৎসর শিশুর কোন তত্ত্বাবধানই লওয়া হয় না। এই সময়ে না লওয়া হয় তাহার শরীরের যত্ন, না লওয়া হয় তাহার মনের যত্ন। পরিমিত খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়ামের অভাবে যেরূপ তাহার শরীরের ক্রম-পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষার প্রথম সোপান প্রণালীবদ্ধ ক্রীড়াকৌতুকের অভাবেও তদ্রূপ তাহার মনোবৃত্তি বিকাশের সুযোগ বিনষ্ট হয়। অবশ্য আমাদের দেশে শিশুজনোচিত নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকের প্রচলন আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে না আছে কোনও ব্যবস্থা, না আছে কোনও প্রণালী। আমরা জানিনা যে, সে গুলির সাহায্যে কি উপায়ে অতি সহজে ও সরলভাবে শিশুদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি, উদ্ভাবনশক্তি এবং কল্পনা ও বিচারশক্তির উন্মেষ সাধিত হইতে পারে। আমরা জানিনা, সেগুলির সাহায্যে কিরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার, সাহস, সাহচর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য জাতির বর্ত্তমান শিক্ষার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, শিশুর শিক্ষাবিষয়ে তাহারা কত আগ্রহ দেখাইতেছে এবং কতরকমের আয়োজন করিতেছে।

যাঁহারা শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকেই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে

শিশুর শিক্ষারাজ্যে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে, সে সকল অকৃত্রিম সাধক ও সমাজসেবকের মধ্যে ডাক্তার মেরিয়া মণ্টেসরীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা-ব্যবসায়দ্বারা তিনি রোম নগরে প্রভূত :অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন এবং স্বকীয় ব্যবসায়ক্ষেত্রে অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে, তিনি আজ রোম নগরের ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধন-মান-যশ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি দরিদ্রের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া তাহাদের শিশুসন্তান-গণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে রত হইলেন। শিশুর শিক্ষাই তাঁহার সাধনার একমাত্র বিষয় হইল।

এই বিদুষী রমণীর প্রাণপাত চেষ্টা ও যত্নের ফলে, আজ পৃথিবী শিশুর শিক্ষাবিষয়ে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছে। তাই আজ জগদ্বাসী তাঁহার পুণ্যপূত জীবনকাহিনী শ্রবণ করিয়া নিজকে কৃতার্থম্মন্য করিতে চায়।

# পানদোষ দমনে

# "পুসীফুট" জন্‌সন।

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়-ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ।"

—রবীন্দ্র নাথ।

যখন পুসীফুট জন্‌সন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ হাওড়া ষ্টেশনে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় বহুসংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়াছিল। ষ্টেশনটি নানাপ্রকার পত্রপুষ্প ও পতাকা-মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ১৯২১ সনের ১১ই অক্টোবর ভোর বেলা ৬টা ৫৪ মিনিটের সময় যখন ট্রেন আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দধ্বনিতে গগনপবন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পুসীফুট জন্‌সন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে, তাঁহাকে পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া কলিকাতাবাসী তাহাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। চতুর্দ্দিকে আনন্দরোল ও মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি বাজিয়া

উঠিল। যে কয়দিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ সভাসমিতি আহ্বান করিয়া নানাভাবে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

এই পুসীফুট জন্‌সন কে? কেনই বা তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কলিকাতাবাসী মিলিত হইয়াছিল? তিনি একজন আমেরিকাবাসী। তাঁহারই প্রাণপাত চেষ্টা ও অপূর্ব্ব সাধনাবলে আমেরিকা আজ পানদোষমুক্ত হইয়া দিন দিন নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির পথে আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইতেছে। আমেরিকার অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণ, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, আপাতমধুর পরিণামবিষ মাদকদ্রব্যের মোহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া দারিদ্র্য-রাক্ষসীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ও পাপের সম্মোহন প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইতে যে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে এই পুসীফুট জন্‌সন। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে আমেরিকাবাসী জনসাধারণ মদ্যপানের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া তন্নিবারণে বদ্ধপরিকর হয়। তাঁহারই চেষ্টায় আমেরিকায় এক মাদকনিবারণী সভা গঠিত হয়। তাঁহারা দেশময় এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। উহারই ফলে আমেরিকায় পানদোষনিবারণী আইন বিধিবদ্ধ হয়।

পানদোষনিবারণই পুসীফুট তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কত সময় যে এজন্য তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, এজন্য কতভাবে যে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। তথাপি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বীয় ব্রত-উদ্যাপনে বিপদাপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তিনি অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র এখন আর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ নাই; তিনি সমস্ত পৃথিবীকে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্ররূপে গ্রহণ

করিয়াছেন। মানবের সেবাই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁহার আবার দেশ বিদেশ কি? যেখানেই সুরারাক্ষসী তাহার বিকট বদন ব্যাদান করিয়া অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে, সেখানেই তিনি উহার গতিরোধ ও বিনাশসাধনে নির্ভীকচিত্তে অসিহস্তে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া উপস্থিত হইতেছেন। তাই তাঁহার এত সম্মান, তাই তাঁহার এত গৌরব।

প্রায় তিন বৎসর হইল, আমেরিকায় আইনের সাহায্যে মদ-বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। ইহার জন্য পুসীফুট জন্‌সনকে যে কত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে, কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কত গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছে, কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ভক্তিশ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে তাঁহাকে পূজা করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

আমেরিকার কোনও এক ষ্টেটে মদবিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আইন অমর্য্যাদা করিয়া তথায় গোপনে মদবিক্রয় চলিতেছে। তাই তথাকার গবর্ণমেণ্ট উইলিয়াম ইউজিন্ জন্‌সনকে এই সকল আইনলঙ্ঘনকারী মদ্যবিক্রেতাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। তখনও তাঁহার নাম "পুসীফুট" হয় নাই। যে ঘটনা হইতে উইলিয়াম ইউজিন্ "পুসীফুট" বলিয়া পরিচিত হয় তাহা এই স্থানে সংঘটিত হয়। এই প্রদেশের মদ্যবিক্রেতারা উইলিয়মের আগমনে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ভয়ে উহাদের মদবিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল, এজন্য তাঁহার উপর উহারা অত্যন্ত রুষ্ট হইল। এমন কি একজন মদ্য-বিক্রেতা প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে উইলিয়ামকে একবার বাগে পাইলে, সে তাঁহাকে খুন করিবে। উইলিয়াম ভীত হইবার লোক ছিলেন

না; বরং তিনি সেই ক্রোধোন্মত্ত মদ্যবিক্রেতাকে অপ্রতিভ করিতে যাইয়া, যে দুর্জ্জয় সাহস ও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল।

একদিন তিনি এক মাতাল সাজিয়া সেই দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানদার তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়াই চিনিত। কিন্তু তিনি এমন কৌশলসহকারে মাতালের হাবভাব, চালচলন ও সাজসজ্জা অবিকল নকল করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চিনিবার একেবারেই উপায় ছিল না। দোকানদার তাঁহাকে প্রকৃতই মাতাল মনে করিয়া লোভ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট গোপনে মদ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল এবং তাঁহার জন্য এক বোতল মদ আনিবার উদ্দেশ্যে গুপ্তভাণ্ডার-গৃহে প্রবেশ করিল। অসাবধানতাবশতঃ দোকানদার তাঁহার পিস্তলটি জন্‌সনের নিকটেই ফেলিয়া রাখিয়াছিল। জন্‌সন এই সুযোগে পিস্তলটি হস্তগত করেন। দোকানদার আসিয়া জন্‌সনের হস্তে মদের বোতল প্রদান করিলে, তিনি পিস্তলটি দোকানদারের কপাল বরাবর উত্তোলন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। দোকানদার হঠাৎ এরূপ অপ্রস্তুত হইয়া লাজে ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তদবধি তাঁহার নাম হইল "পুসীফুট" অর্থাৎ বেড়াল-পা। তিনি আত্মগোপন করিয়া বিড়ালের ন্যায় সেই দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া মদ্যবিক্রেতারা ব্যঙ্গভরে তাহাকে "পুসীফুট" আখ্যা প্রদান করে।

পুসীফুট মদ্যপায়ীদিগের চক্ষুঃশূল ছিলেন। পানাসক্ত ব্যক্তিগণ মদ্যাভাবে একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক ফোঁটা মদের জন্য তাহারা চুরি পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। একদা একটি লোকের মদ্য-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। সে এক হোটেলে কিছু মদ চায়। সেখানে মদ না পাইয়া সে এক ঔষধালয়ে যাইয়া উপস্থিত হয়।

সখানে মদ চাহিলে, ঔষধবিক্রেতা তাহাকে ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র দেখাইতে বলে। সে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল। রোগ না হইলে মদ ব্যবস্থা করিতে পারেন না—এই বলিয়া ডাক্তার তাহাকে বিদায় করিতে চান। তখন ভগ্নাশ হইয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করে—"কিরূপ রোগ হইলে আপনি মদের ব্যবস্থা করিবেন?" ডাক্তার বলিলেন, "সর্পদংশনে মদের ব্যবস্থা করিবার রীতি আছে।" কিছুকাল পরে সেই বেচারা আবার সেই ডাক্তারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পায়ে এক ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া সে ডাক্তারের নিকট আবার মদের ব্যবস্থাপত্র চাহিল। সেই ক্ষতচিহ্ন লোকটির স্বহস্তকৃত কিনা তাহা বুঝিতে ডাক্তারের আর বাকী রহিল না। তথাপি লোকটার মদ্যপানে এইরূপ আসক্তি দেখিয়া, একান্তই না পারিয়া,' তিনি এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। আর সেই হতভাগ্য জীব ব্যবস্থাপত্র লইয়া হর্ষভরে ঔষধালয়ে দৌড়াইল এবং সেখান হইতে মদ ক্রয় করিয়া তাহার পান পপাসার তৃপ্তি সাধন করিল।

এরূপ মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা প্রথমতঃ আমেরিকায় বড় কম ছিল না। কিন্তু যখন তাহারা মদ্যপানের অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিল, তখন তাহারাই আবার মদ্যপাননিবারণের জন্ত বদ্ধপরিকর হইল। ধীরে ধীরে লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল, এবং তাহারা পত্নী, পুত্র ও নিজদিগকে সুরারাক্ষসীর কবল হইতে মুক্ত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। যখন বুঝিতে পারিল যে পাপাসক্ত হইয়া স্বকীয় পাশব প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিতে গিয়া, তাহারা স্বদেশের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সমাজের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছে এবং নিজ নিজ পরিবারের দারিদ্র্যদুঃখ বৃদ্ধি করিয়াছে, তখন তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। শীঘ্রই তাহাদের চৈতন্ত ফিরিয়া আসিল এবং ভিতরকার মানুষ জাগিয়া উঠিল। পানদোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনাদির সাহায্যে অচিরেই তাহারা সরকার বাহাদুরকে মদ্যপাননিবারণের আইনপ্রণয়নে বাধ্য করিতে সমর্থ হইল।

আমেরিকার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এইরূপ কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগাইয়া তোলা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কঠোর সাধনাবলে অসাধ্যও সাধিত হয়। উহাদের বলে মানুষ বাধাবিঘ্ন ও বিপদাপদ্ সমস্ত পদদলিত করিয়া গর্ব্বভরে সিদ্ধিপথে অগ্রসর হয়। সুতরাং পুসীফুটের দৃঢ় সঙ্কল্প, অদম্য উৎসাহ, অমিত তেজ এবং অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? বস্তুতঃ, অক্লান্ত চেষ্টা ও জীবনব্যাপী সাধনাবলেই পুসীফুট আমেরিকায় মদ্যপাননিষেধক আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় আমেরিকায় মদ্যপান একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। উহার সুফল এই হইয়াছে যে, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যবসায়বাণিজ্যের আশাতীত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং দেশের লোকের সঞ্চয়শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির পথে আমেরিকা উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমেরিকা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট ঋণপাশে আবদ্ধ ছিল, আজ সেই আমেরিকার নিকট ঋণী নয় এরূপ জাতি য়ুরোপে নাই বলিলেই হয়। মদ্যপাননিবারণের ফলে আমেরিকার কলোরেডো নামক প্রদেশে এক বৎসরের মধ্যেই বহু নূতন সেভিংসব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দেশে দিন দিন অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, সুতরাং জেলের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। যে বৎসর মিশিগান প্রদেশে আইনের সাহায্যে মদ্যপান নিবারিত হয়, সেই বৎসরই সেই প্রদেশের জেলের সংখ্যা অর্দ্ধাধিক অর্থাৎ ৩০টি কমিয়া গিয়াছে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, আমেরিকায়

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণভাগে প্রায় একলক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারাগৃহ নির্ম্মিত হয়। এই কারাগৃহটি নূতন ভাবে যতদূর উৎকৃষ্ট ও উপভোগ্য করিয়া প্রস্তুত করা সম্ভবপর তাহা করা হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে না হইতেই, সেখানে মদ্যপাননিবারণের আইন প্রচলিত হইল। কাজেই সেই অজস্রঅর্থব্যয়ে নির্ম্মিত সুরম্য কারাগৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার একটি অপরাধীও জুটিল না। কর্তৃপক্ষীয়-গণ বাধ্য হইয়া সেই কারাগৃহটিকে বিদ্যালয়গৃহে পরিণত করিল। ইহা অপেক্ষা নৈতিক উন্নতির উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?"

এইরূপে আমেরিকায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া পুসীফুট জন্‌সন পানদোষনিবারণার্থ ইংলণ্ডে আগমন করেন। এখানেও আমেরিকার ন্যায় তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রথম যখন তিনি ইংলণ্ডে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করিলেন, তখন একদল ছাত্র তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তিনি যেখানেই সভা করিয়া মদ্যপানের দোষ প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন, সেখানেই তাহারা সেই সভা পণ্ড করিয়া দিবার জন্য সমবেত হইত। তিনি যখন সভাক্ষেত্রে গমন করিতেন অথবা সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন, তখন সেই সকল ছাত্রের দল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে উপহাসাস্পদ্ করিতে চেষ্টা করিত। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অধর্ম্মের, দেবতার বিরুদ্ধে দানবের, এইরূপ বিরুদ্ধাচরণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বড় বিরল নয়। যে পাপীদের পরিত্রাণের জন্য যীশু ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন, সেই কৃতঘ্ন ব্যক্তিগণই আবার তাঁহাকে ক্রুশে আবদ্ধ করিয়া অতি নির্ম্মমভাবে হত্যা করিল। হরিপ্রেম বিলাইতে গিয়া জগাই মাধাইয়ের কলসীর কাণায় নিত্যানন্দের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাক্ত হইল; একেশ্বর বাদ প্রচার করিতে যাইয়া মহম্মদকে স্বীয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া

মদিনায় আশ্রয় লইতে হইল; হিন্দুধর্ম্মের লুপ্ত শাস্ত্ররত্ন উদ্ধার ও প্রচার করিতে যাইয়া রাজা রামমোহনকে কত লাঞ্ছিত হইতে হইল। উহাদের তুলনায় পুসীফুটের লাঞ্ছনা যে অতি সামান্য। পুসীফুটের লাঞ্ছনার এখানেই শেষ হয় নাই। যদি এইখানেই শেষ হইত, তাহা হইলে পুসীফুটের অপূর্ব্ব ত্যাগের মাহাত্ম্য যে প্রচারিত হইত না, তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা যে পরিসমাপ্ত হইত না; ধর্ম্মের মহিমা যে উজ্জ্বলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত না। তাই ভগবান্ যুবকদের হৃদয়ে সয়তানের অবাধরাজ্য-স্থাপনব্যাপারে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না। পাপলুব্ধ পানাসক্ত যুবকদল পুসীফুটকে নিগ্রহের উপর নিগ্রহ প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন কোন এক যুবক লোষ্ট্রাঘাতে তাঁহার এক চক্ষের মণি একেবারে নষ্ট করিয়া দিল।

এইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র বা প্রিয় জিনিস প্রদান করিয়াই ভক্তগণ ভগবানের স্থায়ী আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। কপোতকে রক্ষা কারতে যাইয়া আশ্রিত-বৎসল রাজা উশীনর নিজ দেহের মাংস প্রদান করিয়া-ছিলেন, ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া আব্রাহাম স্বীয় পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অতিথির সৎকার করিতে যাইয়া দাতাকর্ণ নিজের পুত্রকে নিজহস্তে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পুসীফুটের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই, বোধ হয়, ভগবান্ তাঁহার একটি চক্ষুরত্ন গ্রহণ করিয়াছেন। চক্ষুরত্ন দান করিয়া পুসীফুটের বল আরও বাড়িয়া গেল। ভগবানের আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিতে লাগিল। সুরাপানের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ প্রবলবেগে চলিতে লাগিল এবং অনিবার্য্য জয়লাভের চিহ্ন সূচিত হইল।

ইংলণ্ডে আইনের সাহায্যে মদ্যপাননিবারণের আন্দোলন যখন চলিতেছিল, তখন ভারতবাসীর আহ্বানে তিনি একবার ভারতে আগমন করেন। ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ভারতের লোক সর্ব্বদাই মিতাচারী। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রমতেই সুরাপান নিষিদ্ধ, তথাপি তাহাদের মধ্যে সুরাপানাসক্ত ব্যক্তির অভাব নাই। বঙ্গদেশে শিক্ষিত সমাজে এখন পানদোষ বড় দেখা যায় না। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী-যুবক মদ্যপানকে শিক্ষা ও সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে যখন এদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বঙ্গদেশের তীক্ষ্ণধী যুবক ছাত্রগণ পর্য্যন্ত এই সুরারাক্ষসীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এইরূপ নৈতিক অধোগতি দর্শন করিয়াই নীতিমান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র এবং প্যারীচরণ সুরাপানের বিরুদ্ধে এ দেশে সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেন। যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া নানা উপায়ে তাঁহারা মিতাচারসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন। তাঁহাদের "মাদকনিবারণী সভার" মূলমন্ত্র এই—যাহাতে মস্তিষ্কের মত্ততা জন্মায় এরূপ কোনও দ্রব্য আস্বাদন করা দূরে থাক স্পর্শও করিব না। সুখের বিষয় তাঁহাদের সেই চেষ্টা বঙ্গের শিক্ষিত যুবক-সমাজে এখন অনেকটা ফলবতী হইয়াছে এবং সুরাপান শিক্ষিতসমাজ হইতে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু মস্তিষ্কের মত্ততা জন্মায় এরূপ দ্রব্যের মোহ হইতে এখনও বঙ্গীয় ছাত্রসমাজ নিজদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারে নাই। ধূমপান মদ্যপানের শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া অবাধে ছাত্র-সমাজে তাহার প্রভাব দিন দিন বিস্তার করিতেছে। তাহার প্রাধান্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শুধু যুবকদের কেন, এমন কি বালকদের মুখ হইতেও পথে ঘাটে,

ট্রেনে ষ্টীমারে, অহরহঃ ধূমোদ্গীরণ হইতেছে। ছাত্রসমাজকে এইরূপ মত্ততা হইতে উদ্ধার করা অতীব প্রয়োজনীয়। ইহাতে শুধু তাহাদের চরিত্রবল নয়, দৈহিক বলও নষ্ট হইতেছে। দুঃখের বিষয় পানদোষের লোপসাধনের জন্য দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে, ছাত্রসমাজে ধূমপাননিবারণের জন্য সেইরূপ কোনও বিশেষ চেষ্টা কার্য্যতঃ হইতেছে না।

যাহা হউক, অশিক্ষিত শ্রমজীবীদিগের মধ্য হইতে সুরাপান দূর করা সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পুসীফুট সুরাপানের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিয়া যে উপায়ে আমেরিকায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। গত দুইশত বৎসর যাবৎ আমেরিকাবাসী তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ মদ্যবিক্রেতাদিগের হস্তে তুলিয়া দিতেছিল; সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিত না। সুতরাং দরিদ্র শ্রেণীর লোকের কষ্টের আর সীমা ছিল না। "দিন আনে দিন খায়"—এই ছিল তাহাদের অবস্থা। এই সকল হতভাগ্যদিগকে মদ্যপানের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুসীফুট দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি আরও কতিপয় সমাজহিতৈষী ব্যক্তির সাহায্যে স্থানে স্থানে মদ্যপাননিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহারা মদ্যপায়ীদিগকে মদের দোকান হইতে দূরে রাখিতে নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, যে পর্য্যন্ত মদের দোকানগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনও চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কাজেই আইনের সাহায্য ভিন্ন মদ্যপাননিবারণের চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। দেশের আইনকে এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে যে, মদ্যবিক্রয় যেন বে-আইনী কার্য্যে পরিণত হয়। সুতরাং দেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। ব্যবস্থাপক-পরিষদের সভ্যগণ তাহাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিল না; মদ্য-বিক্রয়-

নিষেধক আইন-প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল না। কিন্তু সে দেশের লোক জানে যে কি করিয়া এই সকল অকর্ম্মণ্য ও উদাসীন ব্যবস্থাপকদিগের চৈতন্যের উদ্রেক করিতে হয়। যখন নূতন নির্ব্বাচনের সময় আসিল, তখন দেশের লোক ঐ সকল ব্যবস্থাপকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ গৃহের ব্যবস্থা-প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ দলভুক্ত লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিল।

এই সকল নব-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির প্রধান ব্রত হইল দেশে আইনের সাহায্যে মদবিক্রয় নিষেধ করা। কাজেই যখন আবার ব্যবস্থাপক সভায় সুরাপাননিবারণের কথা উঠিল, তখন সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিগণ মদ্য-বিক্রয়নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন। এইরূপে দেশের লোক নিজেদের উদ্ধারের পথ নিজেরাই বাহির করিলেন। আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরারাক্ষসীর যে সকল অসংখ্য প্রমোদ-ভবন ছিল, সে সকল অচিরে ধ্বংসমুখে পতিত হইল। পুসীফুট জন্‌সনের দৃঢ় সঙ্কল্প, জীবনব্যাপী সাধনা, অটল বিশ্বাস ও অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের নিকট ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন কোথায় ভাসিয়া গেল। ভক্তের জীবনব্রত উদযাপিত হইল; ধর্ম্মের জয়বার্ত্তা দেশবিদেশে বিঘোষিত হইল।

